ব্যাংকের সুদ কি হালাল?
মুশতাক আহমাদ কারীমী
Islamicalo.com

ব্যাংকের সুদ কি হালাল

প্রণয়নে
শাইখ মুশ্‌তাক আহমাদ কারীমী
"লেসান্স" জামেআহ সালাফিয়্যাহ, বানারস
চেয়ারম্যান, আলহিলাল এজুকেশনাল সোসাইটি

অনুবাদেঃ
শাইখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা–বাংলাদেশ

ব্যাংকের সুদ কি হালাল

মূল : শাইখ মুশ্‌তাক আহমদ কারীমী
অনুবাদ : শাইখ আবদুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
বই নং–০৭

বাংলাদেশ সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১০ ঈসায়ী

প্রকাশনায় :
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০
ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬
ইমেল : tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

ISBN :

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

মুদ্রণ :
হেরা প্রিন্টার্স.
হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

সূচীপত্র

ইলাহী বিধান ঃ

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾

অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই অবস্থায় উঠবে যে অবস্থা হয় একজন শয়তান (জিন) পাওয়া লোকের। তাদের উক্তরূপ হাশর হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই! অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।[১]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (লোকদের নিকট) তোমাদের সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা এরূপ না কর (সুদ না ছাড়) তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা কবুল করে নাও। কিন্তু যদি তোমরা তোওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।[২]

নববী বিধান

[1] (সূরা বাক্বারাহ ২৭৫ আয়াত)
[2] (সূরা বাক্বারাহ ২৭৮ ২৭৯ আয়াত)

হযরত জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, “ওরা সকলেই সমান।”[৩]

[3] (মুসলিম ১৫৯৭নং মিশকাত ২৪৪ পৃঃ)

অনুবাদকের কথা

চকচক করলেই সোনা হয় না। সোনা চেনা দায়। সোনা চিনতে কষ্টিপাথর কিনে তাতেও যদি ভেজাল থাকে তাহলে আরো বড় দায়। কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথরে ভুল বুঝ ও ব্যাখ্যার ভেজাল থাকলে সত্যই যে সংকটাবর্তের সৃষ্টি হয় তা ফিৎনা ছাড়া আর কি? ব্যবসা মাত্রেই হালাল নয়। হারাম বস্তুর ব্যবসা, হারাম মিশ্রিত বা সন্দিগ্ধ ব্যবসা তথা হারাম উপায়ে ব্যবসা অবশ্যই হারাম। আর যা হারাম তার সহায়তা করাও হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ঃ

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও আল্লাহভীরুতার কাজে একে অন্যের সহায়তা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না। (সূরা মাইদাহ ২ আয়াত) আর আল্লাহর রসূল ﷺ যেমন মদখোর ও সূদখোরকে অভিশাপ করেছেন তেমনি অভিশাপ করেছেন তার কোন প্রকার সহায়ককেও।

সুতরাং হারাম ব্যবসায় পুঁজিবিনিয়োগ করাও হারাম। যেহেতু ব্যাংকের ব্যবসা সূদী ব্যবসা; না মানলেও সন্দিগ্ধ ব্যবসা নিশ্চয়ই। ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে শোষণ না করলেও পরোক্ষভাবে করে। সকলের জানতে না করলেও অজানতে করে।

মুশরিকদের নিকট কিছু বৈধ জিনিস ক্রয় করা বা উপঢৌকন গ্রহণ করা বৈধ হলেও তাদের নিকট থেকে হারাম জিনিস যেমন মদ, শুকরের মাংস তাদের যবেহকৃত মাংস প্রভৃতি ক্রয় করা বা উপঢৌকন গ্রহণ করা অবশ্যই হালাল নয়।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সন্তুষ্টিচিত্তে কেউ যদি অবৈধ মাল বা চুরির মাল দেয়, তবে জেনেশুনে তা গ্রহণ করা কি বৈধ? একদা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর এক ক্রীতদাস তার জাহেলিয়াতে ভাগ্যগণনার বাকী থাকা পারিশ্রমিক আদায় পেলে তা থেকে আবু বকর (রাঃ) ভক্ষণ করে ফেললেন এবং পরে জানতে পেরে তিনি সমস্ত খাদ্য বমি করে ফেললেন।[4]

---

[4] (বুখারী ,মিশকাত ২৭৮৬নং)

কারণ, নবী ﷺ বলেন,

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ.

"যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা তৈরী হয় তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।" অতএব কেউ খুশী করে দিলেও হারাম বা সন্দিগ্ধ মাল ভক্ষণ না করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য নয় কি? আল্লাহর বাণী "আর তোমরা পাপ ও অন্যায় কর্মে পরস্পরকে সহায়তা করো না।" অতএব এই বাণী মাথায় নিয়ে জেনে শুনে হারাম ব্যবসায়ীকে ঋণ দেওয়া নিশ্চয় বৈধ হবে না। আর বাধ্য হয়ে দিতে হলেও সেই ঋণের টাকায় ব্যবসাকৃত লাভ (?) এর ভাগ নেওয়া বৈধ কি রূপে হতে পারে? তা ছাড়া সাধারণ দান এবং ঋণদানের উপর কিছুর প্রতিদান দেওয়ার মাঝে বড় পার্থক্য আছে। ব্যাংকের দেওয়া সূদ যদি সাধারণ দানের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে শতশত গরীব-দুঃস্থ, অনাহারে ধূলালুণ্ঠিত পথের ভিখারীদেরকে ব্যাংক কেন তার সেই এহসানী প্রদর্শন ক'রে অনুদান প্রদান করে না? কেন কেবল মাত্র 'তেলো মাথায় ঢালে তেল আর রুখু মাথায় ভাঙ্গে বেল?' কেন এ এহসানীর অনুদান কেবলমাত্র তাদেরকেই দেয় যারা তাকে টাকা ঋণ দেয়? পক্ষান্তরে বিদিত যে, এই অনুদানের টাকা আসে সরাসরি শর্তারোপিত সূদভিত্তিক ঋণের কারণেই। আবার যে অনুদান ব্যাংক দেয় তাও কত শোষণ, কত সূদ এবং কত হারাম ব্যবসার লভ্যাংশ (?) থেকেই দেয়, কোন পবিত্র বাপুত্তি মাল থেকে নয়। সুতরাং সে অনুদান যে অনুদান নয়; বরং 'গরু মেরে জুতো দান' তা বলাই বাহুল্য।

মুসলমানদের উন্নতির বহু পথ খোলা। নাই বা অবলম্বন করল ঐ অলস অকর্মণ্যদের অসৎ পথ। অবৈধ ও অসৎ অর্থ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে যারা উন্নত নাইবা তাকালো তারা তাদের দিকে?

আল্লাহ যে বলেন,

﴿وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾

"আমি অবিশ্বাসীদের কতককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো

দৃক্‌পাত করো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ হল উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।”[৫]

তাদের নবী ﷺ যে বলেন,

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ.

“সূদের (উন্নতির) পরিমাণ যত বেশীই হোকনা কেন পরিণামে তা কম হতে বাধ্য।” (আহমদ১/৩৯৫, ইবনে মাজাহ ২২৭৯ নং)

তাছাড়া মুসলিমদের প্রধান লক্ষ্য আখেরাত। সুতরাং যে পার্থিব উন্নয়নে আখেরাত বরবাদ হয় তা কি প্রকৃত উন্নতি না অবনতি?

ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর এক অনুগ্রহ। তাতে রয়েছে পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজামের মধ্যবর্তী এক ভারসাম্যপূর্ণ শাশ্বত অর্থব্যবস্থা। এরই অনুসরণে আছে মানুষের চির মঙ্গল।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾

“হে মানবমন্ডলী! পৃথিবীর বুকে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কারণ, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে যা জানো না তা বল।”[৬]

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্‌ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন যে আদেশ করেছেন আম্বিয়াগণকে; তিনি বলেছেন,

[5] (সূরা ত্বা-হা ১৩১ আয়াত)
[6] (সূরা বাকারাহ ১৬৮-১৬৯ আয়াত)

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

“হে রসূলগণ! তোমরা হালাল খাদ্য ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর।”[৭]

আর বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

“হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজী দান করেছি, তা থেকে হালাল বস্তু আহার কর।”[৮]

অতঃপর নবী ﷺ এমন লোকের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) লম্বা সফর করে তার অবস্থা আলুথালু এবং ধূলিমলিন। সে আকাশ দিকে তার হাত দুটিকে তুলে দুআ করে, ‘হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!--’ অথচ তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম তার পরিধেয় বস্ত্র হারাম, তার দেহের রক্ত-মাংস হারাম। সুতরাং তার দুআ আর কিরূপে কখন কবুল হতে পারে?[৯]

ব্যাংকের সূদকে যদি সূদ মনে করেন ও বলে থাকেন, তবে আপনার নিকট তো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু সন্দেহের মেঘমালা যদি আপনার মনের আকাশে ভিঁড় করে তাহলেই সমস্যা। সূদ না বলে যদি আপনি নিজের তরফ থেকে ‘লভ্যাংশ, অনুদান উপহার, এহসানী’ প্রভৃতি বলেন, অথচ ব্যাংকাররা তথা সারা দুনিয়ার লোকেরা তাকে সূদ বলে ও চেনে তাহলেই ইজতিহাদবাজীর দরজা খোলা যায় এ ব্যাপারে। তবে একথা সত্য যে, হালাল ভাবলেও আপনার মনের মাঝে অবশ্যই একটা ‘কিন্তু’ বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন থেকেই যায়। কারণ অধিক সংখ্যক এবং সমস্ত গণ্যমান্য ওলামাগণ সর্বসম্মতভাবে তাকে হারাম বলেন। সুতরাং সন্দেহের মেঘে আপনার চলার পথ অন্ধকার নিশ্চয়ই। অতএব পথ উজ্জ্বল করতে নবী ﷺ এর নির্দেশ শুনুনঃ-

[7] (সূরা মুমিনূন ৫১ আয়াত)
[8] (সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)
[9] (মুসলিম, মিশকাত ২৭৬০নং)

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ.

"(কুরআন হাদীসে) হালাল কি তা স্পষ্ট এবং হারাম যা তাও স্পষ্ট। কিন্তু এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিগ্ধ বিষয়াদি। যা বহু লোকেই চেনে না। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সকল সন্দিগ্ধ বিষয়াদি থেকে বাঁচতে পারে, সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকেও বাঁচিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়াবলীতে আপতিত হয় সে হারামে আপতিত হয়---।"[১০]

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

"সে জিনিস বর্জন কর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা অবলম্বন কর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।"[১১]

ব্যাংক সম্বন্ধে আপনার মনে যে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের কালো মেঘ ঘনীভূত আছে---আশা করি তা এই পুস্তিকার ঝড়ে উড়ে গিয়ে আপনার হৃদয়গগন স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। আর এই আশাতেই অনুবাদের এই পদক্ষেপ। আশা পূর্ণ হলে শ্রম সার্থক হবে।

মূল বইটি উর্দূ ভাষায় লিখিত। লেখক বানারসের সালাফিয়্যাহ ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করার পর মদীনা নববিয়্যায় কর্মরত। তিনি আরো কয়েকখানি পুস্তক-প্রণেতা। সরাসরি তাঁরই কথামতে এই পুস্তিকা বাংলায় রূপদান করে বাংলাভাষী ভাইদেরকে উপহার দিতে পেরে আমি আনন্দবোধ করছি। আল্লাহ আমাদের এই নগণ্য খিদমতকে কবুল করে মুসলিম সমাজকে সুপথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

দ্বীনের খাদেম
আব্দুল হামীদ আলমাজমাআহ **১২/১২/৯৭**

[10] (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৬২নং)
[11] (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ২৭৭৩নং)

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد :

ইসলাম বিশ্বজনীন ও কালজয়ী ধর্ম। এর আহকাম ও নির্দেশাবলী ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। ইসলাম শান্তি, সন্ধি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রীতি, মিলন, সহানুভূতি ও সমবেদনার ধর্ম। ইসলাম উন্নয়ন ও বদান্যতার ধর্ম। যার আহকাম ও নীতিমালায় রয়েছে সরলতা ও উদারতা।

সঙ্কীর্ণতা, কঠিনতা, জটীলতা ও কষ্ট-সমষ্টির নাম ইসলাম নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন কোণকেই ইসলাম তার অনুসারীদের বিবেকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে না। বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থ-বিনিয়োগ করার সঠিক পথে কোন প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে না। নিষেধ করে না শিল্প, কারিগরি ও কৃষিকার্যে উৎকর্ষসাধন ও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকে বরং ইসলাম তো এই ধরনের কর্মসমূহকে মুসলিম জনগণের সাফল্যের সোপান এবং সুখ ও কল্যাণ লাভের উপকরণরূপে নির্ধারণ করেছে। ইসলাম সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীকে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহদান করে এবং এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপার্জন তাই; যা সে নিজ হাত দ্বারা করে থাকে।[১২]

কিন্তু বর্তমান যুগে উপার্জনের বিভিন্ন নিত্য-নতুন পদ্ধতি ও প্রণালী আবিস্কৃত হয়েছে এবং এরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, ব্যাংক প্রভৃতি; যে সব প্রতিষ্ঠান আজকের সকল অর্থনৈতিক আইন-কানুনের উপর নিজের কবজা ও অধিকার জমিয়ে বসে

[12] (বুখারী, মিশকাত ২৭৫৯ নং)

আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার লেন-দেন ও তার নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাও আমাদের জন্য জরুরী হয়ে গেছে।

ফকীহগণ বলেন, من جهل بأهل زمانه فهو جاهل

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার সমসাময়িক যুগের লোকেদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না; অর্থাৎ তার নিজের যুগের লোকেদের জীবন-পদ্ধতি, তাদের সাময়িক পরিস্থিতি ও জীবিকানির্বাহের ধারা তথা তাদের প্রকৃতি ও রুচি সম্বন্ধে যে অবগত নয় সে অজ্ঞ ও জাহেল।[১৩]

একজন আলেমের জন্য যেমন কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন আহকাম জানা জরুরী, ঠিক তেমনিই তার সমসাময়িক কালের আচরিত প্রথা ও ট্রেডিশন এবং সমকালীন মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভও জরুরী। এ ছাড়া শরীয়তের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছতে পারেন না। হানাফী মযহাবের ফকীহগণের মধ্যে এক ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ ফিক্হী মাসায়েল লিপিবদ্ধ করার সময় নিয়মিত বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট বসতেন, তাদের লেন-দেনের রীতিধারা বুঝতেন এবং মার্কেটে কোন্ ধরনের বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত তা লক্ষ্য করতেন। কারণ ঐ শ্রেণীর জ্ঞান লাভ একজন আলেমের জন্য এবং বিশেষ করে একজন মুফতীর জন্য ফরয। যাতে করে ঐ শ্রেণীর কোন সমস্যা বা প্রশ্ন তাঁর নিকট এলে তিনি তার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে দস্তুরমত অবগত হন। নচেৎ এ ছাড়া তিনি কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই পারেন না। পরন্তু এ কথাও বলা হয়েছে যে, যখন কোন সমাজে কোন অবৈধ কাজ-কারবার শুরু হয়, তখন আলেম ও মুফতীর কর্তব্য কেবল সেই কাজ বা কারবার হারাম ও অবৈধ ফতোয়া দেওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় না; বরং ইসলামী আহ্বায়ক হিসাবে তাঁর জরুরী কর্তব্যের মধ্যে ঐ কাজও শামিল যে, তিনি তা অবৈধ চিহ্নিত করার পরপরই তার বিকল্প বৈধ পদ্ধতি ও কারবার কি; তাও বাতলে দেবেন। এবং সেই বিকল্প ব্যবস্থা যেন হয় আমলের যোগ্য এবং শরীয়তের মোতাবিকও।

ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন স্বপ্নের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সাত বছর খরা বা অনাবৃষ্টি আসবে ঐ খবর তো পরে বললেন; কিন্তু

[13] (শরহে উকূদি রসমিল মুফতী ৯৮ পৃঃ)

তার পূর্বেই তিনি ঐ খরার কবল হতে মুক্তি লাভের উপায় বলে দিলেন; বললেন, ঃ

﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾

অর্থাৎ- তোমরা খেতের যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত বাকী শস্যকে শীষ সমেত রেখে দেবে। (সূরা ইউসুফ ৪৭ আয়াত)

উক্ত আয়াত হতে এ কথাই বুঝা যায় যে, সৎপথের আহ্বায়কের জন্য কোন হারাম কাজকে কেবল হারাম চিহ্নিত করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তার সঙ্গে সাধ্যমত ঐ হারাম কাজ থেকে মুক্তি লাভের বিকল্প পথও বলে দেওয়া আবশ্যক। আর সেই পথ তিনি তখনই বলতে পারেন, যখন তিনি ঐ কাজের প্রকৃতত্ব সম্বন্ধে যথাযথ অবগত হবেন।

উক্ত কথার প্রতি লক্ষ্য রেখে একাজ জরুরী মনে করা হয়েছে যে, নব জীবিকানির্বাহ পদ্ধতি এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত সেই সকল জ্ঞাতব্য-বিষয় একত্রে সঞ্চিত হোক যার প্রয়োজনীয়তা অনুরূপ কোন সমস্যার সমাধান দানের সময় একজন আলেমের নিকট দেখা দিতে পারে।

যেহেতু ব্যাংক তথা অন্যান্য অর্থ-বিনিয়োগ সংক্রান্ত সংস্থা ও কোম্পানীর ভিত্তিই পুঁজিপতিত্ব ও সুদের উপর সেহেতু সুদের প্রকৃতত্ব ও মূলতত্ত্ব জেনে নেওয়া জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, এক ব্যক্তি নিজের পকেট থেকে মাত্র ১০লাখ টাকা কোন ব্যবসায় লাগাল। আর ৯০লাখ টাকার লোন নিল ব্যাংক থেকে। এভাবে সে এক কোটি টাকা নিয়ে ব্যবসা করল। ধরে নিন্, ঐ ব্যবসায় তার ৫০ শতাংশ লাভ হল এবং এক কোটি টাকা দেড় কোটি টাকায় পরিণত হল। এবারে এ পুঁজিপতি ৫০ লাখ টাকার লাভ থেকে মাত্র ১৫ লাখ টাকা সূদ হিসাবে ব্যাংককে দেবে। যা থেকে ব্যাংক নিজের লাভ রেখে বড় জোর ১০ অথবা ১২ লাখ টাকা সেই শত শত জনগণের মাঝে বন্টন করবে যাদের আমানত তার নিকট জমা (ডিপোজিট) আছে। যার স্পষ্ট পরিণতি এই যে, উক্ত ব্যবসায় যে সমস্ত শত শত লোকের ৯০ লাখের পুঁজি বিনিয়োগ করা ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে যাদের পুঁজির বলে এত পরিমাণ লাভ অর্জন সম্ভব হল, তাদের ভাগে এল মাত্র ১০ অথবা ১২ লাখ টাকা। পক্ষান্তরে যে পুঁজিপতি

কেবলমাত্র ১০ লাখ টাকার পুঁজি-বিনিয়োগ করেছিল তার ভাগে এ ব্যবসার লাভ স্বরূপ গেল ৩৫ লাখ টাকা! পরন্তু মজার কথা এই যে, উক্ত ১৫ লাখ টাকা যা ব্যাংককে দেওয়া হয়েছে এবং তার মাধ্যমে যে (১০ বা ১২ লাখ) টাকা জনসাধারণের নিকট পৌঁছেছে সেই টাকাকে পুঁজিপতি নিজের উৎপাদন বাবদ মূল খরচের মধ্যে গণ্য করে; আর যে টাকা অবশেষে তার পকেটে পড়ে না বরং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পকেটে পড়ে। কারণ এ ব্যবসায়ে পুঁজিপতি যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করেছে তার মূল্য নির্ধারণকালে ব্যাংককে প্রদত্ত সূদের অর্থকেও সে এ মূল্যের মধ্যে শামিল করে। আর এইভাবে বাস্তবপক্ষে তার নিজের পকেট থেকে একটি পয়সাও খরচ হয় না। পক্ষান্তরে যদি তার এ ব্যবসা কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা কোন দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ বহন করে বীমা কোম্পানী। আর এ বীমা কোম্পানীতেও সঞ্চিত থাকে হাজার হাজার জনসাধারণের অর্থ; যারা মাসিক বা বাৎসরিক হিসাবে নিজেদের উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ সেখানে জমা করে থাকে। অথচ না তাদের কোন বাণিজ্যশালায় আগুন লাগে, আর না-ই তারা কোন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। সুতরাং সাধারণতঃ তারা অর্থ জমাই করে যায়, ছাড়ানোর পালা খুব কমই পড়ে।

অপর দিকে এমনও পুঁজিপতি আছে, যার ব্যবসায়ে খুব বড় নোকসান ঘটে গেলে সে ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। যার ফলে সে ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে যায়। এমত পরিস্থিতিতে এ পুঁজিপতিদের তো খুব কম অঙ্কের টাকাই নষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ণ নোকসান সেই অর্থ জমাকর্তাদের হয় যাদের অর্থবলে এ পুঁজিপতিরা ব্যবসা করে থাকে। (কারণ ব্যাংক তখন তাদের জমা রাখা টাকা ফেরৎ দিতেও অসমর্থ হয়।)

মোট কথা সুদের এই নীতির কারণেই জাতির সমস্ত পুঁজিকে কেবল কয়েকটি বড়বড় পুঁজিপতি তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। আর এর বিনিময়ে জাতিকে প্রত্যর্পণ করে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অংশ। পরন্তু এই কিঞ্চিৎ অংশকেও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের আসল মূল্য গণ্য করে পুনর্বার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিকট থেকে ওসুল করে নেয় এবং নিজেদের ঘাটতিও পূরণ করে জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ থেকে। (কারণ জনসাধারণ

তাদের নির্ধারিত মূল্যেই উক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য।) এইভাবে সুদের সমষ্টিগত গতিমুখ এই পরিণতির দিকে থাকে যে, জনসাধারণের সঞ্চয়ের কারবার সংক্রান্ত লাভ অধিকাংশ বড় পুঁজিপতিদের নিকট পৌঁছে এবং জনসাধারণ তদ্দারা যথাসম্ভব কম উপকৃত হয়। অতএব এইভাবেই আর্থিক উচ্ছ্বাসের গতিমুখ সর্বদা পুঁজিপতিদের দিকেই থেকে যায়। এ ধরনের পরিণাম ও ফল দেখার পরেও অনেকে ব্যাংকের সুদকে বৈধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ উচিত ছিল, ব্যাংকের সুদকে বৈধ প্রতিপাদন করার পরিবর্তে খোদ ব্যাংককেই ইসলামিক রূপ দান করা। অর্থাৎ ব্যাংকের নিয়মনীতিকে ইসলামী কানুনের ছাঁচে ঢেলে তার উপর আমল করার চেষ্টা করা হত এবং জগতের মানুষকে এ জানিয়ে দেওয়া যেত যে, ইসলামী নীতির উপর আমল করলে এই এই উপকার সাধন হয়। বিশ্ববাসীকে এই ভরসা দেওয়া যেত যে, ইসলামী কানুনের উপর আমলের মাধ্যমেই মানব-জাতি সুখ-সমৃদ্ধি ও সফলতার পথে ধাবমান হতে পারে। হয়তো ঐ শ্রেণীর মানুষদের প্রচেষ্টা ঠিক এ ব্যক্তির মতই; যে চিনির ডিব্বার উপরে লিখে রাখে 'এটা লবণের ডিব্বা।' তার উদ্দেশ্য থাকে, যাতে পিঁপড়ের দল ধোঁকা খেয়ে চিনির কথা বুঝতে না পারে। কিন্তু ডিব্বার উপর পরিবর্তিত নাম দেখে পিঁপড়ে ধোকা খায় না। বরং তারা নিজেদের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় দ্বারা আসল ব্যাপার জেনে চিনি পর্যন্ত পৌঁছেই যায়। তদনুরূপ আপনি ব্যাংকের সুদের নাম যাই রাখুন না কেন; তার নাম 'মুনাফা' রাখুন অথবা 'বোনাস' (Bonus) 'লভ্যাংশ' রাখুন অথবা 'অনুগ্রহ', নাম পরিবর্তনে বস্তুর আসলত্ব ও প্রকৃতত্ব পরিবর্তিত হয়ে যায় না। মুমিন নিজের ঈমানী অন্তর্দৃষ্টিতে তাকে সুদই বুঝবে।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! আপনাদের দৃষ্টি সম্মুখে এই পুস্তিকায় ব্যাংকের সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রামাণিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বাগ্রে কুরআন ও হাদীস থেকে সুদের অবৈধতা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর সুদ ও ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য এবং প্রাক ইসলামী জাহেলিয়াত যুগের সুদের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ইসলাম সুদকে ব্যাহত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সে পদ্ধতির কথা বড় চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পরে সুদের চারিত্রিক,

সামাজিক, আর্থ-সামাজিক তথা জীবন ও জীবিকা-নির্বাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর কোম্পানী এবং তার লেন-দেন পদ্ধতি, ব্যাংক ও তার এতিহাসিক পটভূমিকা, ব্যাংকের শ্রেণীভেদ এবং তার বিভিন্ন ফাংশন প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর ব্যাংকের সর্বনাশিতা দেখানো হয়েছে।

অতঃপর ব্যাংকের সুদকে বৈধকারীদের দলীলসমূহকে সমালোচনামূলক বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে এবং হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিমায় সে সব দলীলের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর ব্যাংকের সুদ হারাম হওয়ার উপর বিভিন্ন কন্‌ফারেন্স্ ও ফিক্‌হ একাডেমিতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে যে রায় পাস হয়েছে তার সিদ্ধান্ত -নামা এবং এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে রায়দাতাদের নামের তালিকা পরিবেশিত হয়েছে ।

মিসরের এক মুফতী উক্ত সুদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে যে ফতোয়া দিয়েছেন, তার প্রতিবাদে আযহার ইউনিভার্সিটির উলামায়ে কেরামের একটি টিম মক্কা মুকার্রামায় একটি ইলমী বিবৃতি প্রকাশ ও প্রচার করেন, সেই বিবৃতিপত্রে স্বাক্ষরকারীদের নাম তাঁদের স্বাক্ষর-সহ দেখানো হয়েছে। পরিশেষে ব্যাংকের বিকল্প ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হয়েছে। অতঃপর আলোচিত হয়েছে বীমার কথা। বীমার বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের মধ্য হতে 'সোশল ও মিউচিউল ইনস্যুরেন্স' এর বৈধতার উপর মক্কায় যে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার খসড়া পেশ করা হয়েছে; যাতে স্বাক্ষরকারী উলামাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত উলামাবৃন্দ সকল ধরনের 'কমার্সিয়াল ইনশ্যুরেন্স'কে হারাম ঘোষণা করেছেন।

আর সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে বীমার বিকল্প ব্যবস্থাও।

অনুরূপ বিভিন্ন আলোচনার সাথে পুস্তিকাটি এখন আপনার হাতে। এই পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যাংকের সুদের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণের বিশদ ব্যাখ্যা; কারো সমালোচনা করা নয়। (ব্যাংকের সুদ বৈধকারীদের) বিভিন্ন দলীলসমূহকে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তিত্বের সমালোচনা এসে পড়েছে, তবে তা ঠিক সেই পর্যায়ের;

যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইসমাঈল আল- হারাবী রাহিমাহুল্লাহ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه.

অর্থাৎ, শায়খুল ইসলাম আমাদের প্রিয় পাত্র; কিন্তু আমাদের নিকট 'হক' হল তাঁর চেয়েও অধিক প্রিয়।

এর সাথে সাথে আমি সেই বন্ধু ও সঙ্গীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যাঁরা এই পুস্তিকার পান্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ দিয়ে, বিভিন্ন বই-পুস্তক সংগ্রহ করে, হাওয়ালাসহ হাদীস উদ্ধৃত করে অথবা অন্য কোন প্রকার প্রয়োজনে আমার সহায়তা করেছেন।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাকে হক কথা বলতে, লিখতে এবং হক কথার তবলীগ ও প্রচার করতে তওফীক ও প্রেরণা দিন।

এই নগণ্য আমল ও কর্মকে তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার অসীলা বানিয়ে নিন, এই পুস্তিকা দ্বারা মুসলিম জনগণকে উপকৃত করুন এবং তাদের জন্য হেদায়েতের অসীলা করুন, আর যাদের জীবন ভুল পথে পরিচালিত--- বিশেষ করে ব্যাংকের সুদের ব্যাপারে যারা ভুল রাস্তা অবলম্বন করেছে তাদেরকে সরল পথের দিকে ফিরে আসার তওফীক দান করুন। আমীন।

এই পুস্তিকা পাঠ করার পর যদি একটি মুসলিম ভাইও ব্যাংকের সুদ খাওয়া থেকে তওবা করার তওফীক লাভ করেন তাহলে আমরা জানব যে, আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে। আর প্রকৃত হেদায়েতের মালিক আল্লাহ।

তিনিই প্রার্থনা শ্রবণ ও মঞ্জুরকারী।

يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، وصـل اللّٰهُمَّ وسـلم وبـارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يا رب العالمين.

ইসলাম ও মুসলিমদের খাদেম
মুশ্‌তাক আহমদ কারীমী
মদীনা ত্বাইয়্যিবা, সউদী আরব
তারীখ ২৩/৩/ ১৯৯৭ ঈসায়ী
রবিবার ১৪/১১/১৪১৭হিঃ

সূদের অবৈধতা

আল্লাহ তাআলা সুদকে সর্বতোভাবে কঠোররূপে হারাম গণ্য করেছেন এবং সুদখোরদের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে মানবজাতিকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন।

তিনি বলেন, ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (লোকদের নিকট) তোমাদের সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও--- যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা এরূপ না কর (সুদ না ছাড়) তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা কবুল করে নাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।[১৪]

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেছেন,

الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.

"সুদ (পাপের দিক থেকে) ৭০ প্রকার। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট (পাপের) সুদ হল মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা! (অর্থাৎ সুদ খাওয়ার গোনাহ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশী।)[১৫]

ফিরিশতার হাতে গোসল লাভকারী সাহাবী হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية.

অর্থাৎ "জেনে শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়ার গোনাহ আল্লাহর নিকট ৩৬ বার ব্যভিচার করার চেয়েও বড়।"[১৬]

---

[14] (সূরা বাক্বারাহ ২৭৮ ২৭৯ আয়াত)

[15] (ইবনে মাজাহ ২২৭৪ নং, হাকেম ২/৩৭, মিশকাত ২৪৬ পৃঃ)

[16] (মুসনাদে আহমদ ৫/২২৫, দারাকুত্বনী ২৯৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩৩ নং, মিশকাত ২৪৬ পৃঃ)

সুদখোরের নিন্দাবাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ঃ

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই অবস্থায় উঠবে যে অবস্থা হয় একজন শয়তান (জ্বিন) পাওয়া লোকের। তাদের উক্তরূপ হাশর হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই! অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। (সূরা বাক্বারাহ ২৭৫ আয়াত)

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء.

অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, "ওরা সকলেই সমান।" (মুসলিম ১৫৯৭নং মিশকাত ২৪৪ পৃঃ)

প্রিয় ভাই মুসলিম!

এবার চিন্তার বিষয় এই যে, সেটা কি এমন জিনিস যার ব্যাপারে এত বড় ধমক ও তিরস্কার শুনানো হয়েছে। তার প্রকৃতত্ব কি? তা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ও জিনিসে হয়ে থাকে? তা এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি? জাহেলিয়াতের যুগে কি কি প্রকার সুদী কারবার হত; যা কুরআন ও সুন্নাহতে নিষিদ্ধ হয়েছে? এ সকল বিষয়ে অবগত হওয়া একান্ত জরুরী; যাতে মুসলিম সে সব থেকে দূরে থাকতে পারে।

'সূদ' এর সংজ্ঞার্থ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদকে (ربا) 'রিবা' বলা হয়। এই শব্দের মূল ধাতু হল (ر ب و) যার আভিধানিক অর্থ হল, বাড়, বৃদ্ধি, আধিক্য, স্ফীতি প্রভৃতি। رَبَا অর্থাৎ বেড়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে। ربا السويق

অর্থাৎ ছাতু ঘোলার পর ফেঁপে উঠেছে। ربا في حجره অর্থাৎ সে তার কোলে প্রতিপালিত (বড়) হয়েছে। أربى الشيء সে জিনিসটাকে বাড়িয়েছে ইত্যাদি অর্থ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদেও উক্ত শব্দ 'বৃদ্ধি'র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ঃ

﴿يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাহকে বৃদ্ধি দেন।[১৭]

শরীয়তের ফিক্‌হবিদ্‌দের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা হল,

هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.

অর্থাৎ, একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের পরস্পর আদান-প্রদান করার সময় একজনের অপরজনের নিকট এমন বেশী নেওয়া যাতে এ বেশী অংশের বিনিময়ে কোন জিনিস থাকে না। (আল বুনূকুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান নাযারিয়্যাতি অত্‌তাত্ববীক্ব ৪৪ পৃঃ)

ফতোয়া আলামগীরীতে সুদের নিম্নরূপ সংজ্ঞা করা হয়েছে;

الربا عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة ما بمال.

অর্থাৎ, এক মালের বদলে অন্য মালের আদান-প্রদানকালে সেই অতিরিক্ত (নেওয়া) মালকে সূদ বলা হয়; যার কোন বিনিমেয় থাকে না।

হেদায়াতে সুদের সংজ্ঞা এইভাবে করা হয়েছে;

الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي من عوض شرط فيه

অর্থাৎ, লেন-দেন করার সময় সেই অতিরিক্ত মালকে সুদ বলা হয়; যা কোন একপক্ষ শর্ত অনুসারে কোন বিনিময় ছাড়াই লাভ করে থাকে।

বুঝা এই গেল যে, মূল থেকে যে পরিমাণ অংশ বেশী নেওয়া বা দেওয়া হবে সেটাকেই সুদ বলা হবে। সুতরাং সুদের সংজ্ঞা হল এইরূপ; "ঋণে দেওয়া মূল অর্থের চেয়ে সময়ের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ শর্ত ও নির্দিষ্টরূপে নেওয়া হয় তার নাম হল সুদ।"

[17] (সূরা বাক্বারাহ ২৭৬ আয়াত)

মূল অর্থ থেকে কিছু বৃদ্ধি, সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ এবং এই লেন-দেনে বৃদ্ধি শর্ত হওয়া---এই তিন উপাদানে গঠিত বস্তুর নাম সুদ হবে। আর প্রত্যেক সেই ঋণের আদান-প্রদান যার মধ্যে উক্ত তিন প্রকার উপাদান পাওয়া যাবে তাকে সুদী আদান-প্রদান বা কারবার বলা হবে। এখানে দেখার বিষয় এ নয় যে, সে ঋণ ব্যবসার জন্য নেওয়া হয়েছে অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। এবং সেই ঋণ-গ্রহীতা ব্যক্তি গরীব নাকি ধনী, কোম্পানী নাকি সরকার। সে যাই হোক না কেন অনুরূপ ঋণের কারবার সুদের কারবার।

জাহেলিয়াতের সুদ

এবারে আসুন, আমরা দেখি, জাহেলিয়াতের সুদ কেমন ছিল; যে সুদের অবৈধতার উপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে ব্যাপারে নবী ﷺ এর রয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

জাহেলিয়াতের যুগে কারবারের যে পদ্ধতিকে 'রিবা' বা সুদ বলা হত তার বিভিন্ন ধরন একাধিক বর্ণনায় পাওয়া যায়।

কারবারের একটি ধরন এরূপ ছিল;

হযরত কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জাহেলিয়াত যুগের সুদ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন মাল বিক্রয় করত এবং দাম মিটাবার জন্য একটি সময় নির্ধারিত করত। এবারে সেই নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ পূরণ হওয়ার পর যদি ক্রেতার নিকট দাম মিটাবার মত অর্থ না হত, তাহলে বিক্রেতা তার (ক্রেতার) উপর অতিরিক্ত অর্থ চাপিয়ে দিত এবং (দাম মিটাবার) সময় আরো বাড়িয়ে দিত।'[১৮]

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জাহেলিয়াতের সুদ এই ছিল যে, এক ব্যক্তি কারো নিকট ঋণ করত এবং বলত, যদি তুমি আমাকে ঋণ পরিশোধে এতটা সময় দাও, তাহলে আমি তোমাকে এত এত বেশী দেব।'[১৯]

[18] (তাফসীর ইবনে জারীর ৩/৬২)
[19] (ঐ ৩/৬২)

আবু বাকার জাসসাস (রাহিমাহুল্লাহ)-এর প্রতিপাদন অনুসারে জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত সুদ ছিল এই যে, 'তারা একে অন্যের নিকট ঋণ গ্রহণ করত এবং আপোসে এই চুক্তি করে নিত যে, এত সময় (ঋণ রাখলে) আসল ছাড়া আরো এত টাকা বাড়তি আদায় করতে হবে।' (আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর প্রতিপাদন মতে, জাহেলিয়াত যুগের লোকেদের মধ্যে এই রীতি ছিল যে, 'এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা ধার দিত, অতঃপর সে তার (ঋণগ্রহীতার) নিকট থেকে মাসিক হারে সুদ হিসাবে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ওসুল করত। এর পর যখন ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়কাল শেষ হয়ে যেত, তখন ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আসল টাকা চাওয়া হত। সে সময় পরিশোধ করতে না পারলে তাকে পুনরায় অতিরিক্ত সময় অবকাশ দেওয়া হত এবং সেই সঙ্গে সুদের পরিমাণও দেওয়া হত বাড়িয়ে। (তফসীরে কাবীর ২/৩৫১)

উপরে উল্লিখিত সুদের সংজ্ঞার্থ এবং জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত সুদী কারবার নিয়ে যদি একটু চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান যুগে ব্যাংকসমূহে যে সুদী কারবার চলছে, তা হুবহু জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত সুদী কারবার সমূহের অন্যতম; যার অবৈধতার ব্যাপারে সারা মুসলিম উম্মাহ একমত।[২০]

জাহেলিয়াত যুগে উক্ত প্রকার সুদী কারবার প্রচলিত ছিল। যাকে আরববাসিগণ সুদ বলত। সেই কারবারকেই কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তারা উক্ত সুদী কারবারকে ব্যবসার মত বৈধ ও জায়েয মনে করত; যেমন বর্তমান জাহেলিয়াত যুগেও তাই মনে করা হয়।

ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ব্যবসার ফলে মূলধনে যে অতিরিক্ত অর্থ বৃদ্ধি পায় সেই অর্থ এ অর্থ থেকে ভিন্নতর যা সূদী কারবারে বৃদ্ধি পায়। প্রথম প্রকার অতিরিক্ত অর্থ হালাল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার অতিরিক্ত অর্থ হারাম।

[20] জাহেলিয়াতের যুগেও যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সুদের উপর ঋণ নেওয়া-দেওয়া হত, তা বিশেষভাবে প্রতিপাদিত করেছেন মওলানা মওদূদী। দেখুন, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ১৭২-১৮০ পৃঃ, আরো দেখুন, ডক্টর ইউসুফ কারযবীর ফাওয়াইদুল বুনূক ৩০-৩১ পৃঃ - অনুবাদক।

আল্লাহ তাআলা জাহেলিয়াত যুগের এ লোকদের ধারণাকে খন্ডন করে বলেন, ঃ

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾

অর্থাৎ তা এই জন্য যে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। (সূরা বাক্বারাহ ২৭৫ আয়াত) এ ব্যাপারে মুসলিমের জন্য আবশ্যক এই যে, সে ব্যবসা এবং সুদী কারবারের মধ্যে পার্থক্য জানবে, সুদের বৈশিষ্ট্য চিনবে এবং তার সর্বনাশিতার ব্যাপারে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করবে। তাহলেই সে জানতে পারবে, ইসলাম কোন্ ভিত্তিতে তা হারাম নিরূপণ করেছে।

ব্যবসা এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য

ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয় এই যে, বিক্রেতা কোন জিনিসকে বিক্রয় করার জন্য পেশ করে। বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে সেই জিনিসের দাম কত তা নির্দিষ্ট ও নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সেই দাম বা মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা সেই জিনিসটাকে বিক্রেতার নিকট থেকে গ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে সুদ এই যে, কোন ব্যক্তি তার মূলধন কোন অপর এক ব্যক্তিকে ধার দেয় এবং এই শর্ত আরোপ করে যে, 'এত সময়ের মধ্যে আসলের উপর এত টাকা বেশী নেব।' আসল টাকা ছাড়া এ বাড়তি টাকার নামই হল সুদ। যা কোন জিনিসের মূল্য নয় বরং তা হল কেবল (ঋণ গ্রহীতাকে তার ঋণ পরিশোধে) কিছু সময় ও অবকাশ দেওয়ার বিনিময়।

অতএব ব্যবসা এবং সুদ এই উভয় প্রকার লেন-দেন নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনার পর নিম্নোক্ত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়ঃ-

১- ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই মুনাফা বিনিময় সমানভাবে হয়ে থাকে; কারণ ক্রেতা এ ক্রীত বস্তু বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রয় করে তার দ্বারা উপকৃত হয়। এবং বিক্রেতাও তার সেই শ্রম, বুদ্ধি এবং সময়ের মূল্য গ্রহণ করে; যা সে ক্রেতার জন্য এ জিনিস প্রস্তুত ও সরবরাহ করার পথে ব্যয় করেছে।

পক্ষান্তরে সুদী কারবারে দুই পক্ষের মুনাফা বিনিময় সমানভাবে হয় না। সুদগ্রহীতা তো এক নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ নিয়ে নেয়; ফলে সে

নিশ্চিতরূপে উপকৃত হয়। কিন্তু সুদদাতার জন্য কেবল (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ মিলে; যাতে সে উপকৃত হয় কি না তা অনিশ্চিত। কারণ ঋণ গ্রহীতা যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা অভাব মিটাবার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তবে নিঃসন্দেহে এ অবকাশ অপকারী। আর যদি সে ব্যবসা করার জন্য নিয়ে থাকে, তাহলে অবকাশে যেমন তার উপকার বা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তেমনি আছে অপকার বা ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা। কিন্তু ঋণদাতা সর্বাবস্থায় তার মুনাফার (সুদের) একটা নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকে; তাতে ঋণগ্রহীতার কারবারে লাভ হোক চাই না হোক। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হল যে, সুদী কারবার কেবল একপক্ষের লাভ এবং অপর পক্ষের ক্ষতি, অথবা একপক্ষের নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট লাভ এবং অপর পক্ষের অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট লাভের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

২- ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যত পরিমাণেই লাভ গ্রহণ করুক না কেন, গ্রহণ করে সে মাত্র একবার। পক্ষান্তরে সুদী কারবারে অর্থ লগ্নিকারী তার অর্থের উপর ধারাবাহিকভাবে বারংবার মুনাফা বা সূদ গ্রহণ করতে থাকে এবং সময়ের গতি (লম্বা হয়ে) বাড়ার সাথে সাথে তার সুদের অঙ্কও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ঋণগ্রহীতা এ অর্থ দ্বারা যতই উপকৃত হোক না কেন, তার এ উপকার এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর বিপরীত পক্ষে ঋণদাতা যে উপকার ও লাভ অর্জন করে থাকে, তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই।

৩- ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায় পণ্য-দ্রব্য ও তার মূল্য বিনিময় হওয়ার সাথে সাথেই আদান-প্রদানের ব্যাপার শেষ হয়ে যায়। এর পরে ক্রেতা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে এবং বিক্রেতাকে কোন জিনিস ফেরৎ দিতে (বা নতুন ভাবে দিতে) হয় না। পক্ষান্তরে সুদী কারবারে ঋণগ্রহীতা টাকা নিয়ে খরচ করে ফেলে। অতঃপর সেই খরচ-করা টাকা যোগাড় করে বাড়তি সুদ-সহ ফেরৎ দিতে হয়।

৪- ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে মানুষ নিজের মেহনত ও বুদ্ধি ব্যয় করে এবং তারই পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সুদী কারবারে সুদখোর কেবলমাত্র তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল দিয়ে বিনা মেহনত ও কষ্টে অপরের কামাই ও উপার্জনে অংশীদার হয়ে বসে।

এছাড়া সুদ মানুষের মাঝে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, অর্থলোলুপতা ও ধনপূজার মত প্রভৃতি গুণ সৃষ্টি করে। দুই জাতির মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ আনয়ন করে। জাতির ব্যক্তিবর্গের মাঝে সহানুভূতি ও পরস্পরকে সহায়তা করার নৈতিক সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। সমাজের ধন-দৌলতের স্বাধীন আবর্তনকে ব্যাহত করে, বরং এ ধন-সম্পদের গতিমুখ নির্ধনদের নিকট থেকে ধনপতিদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে জনসাধারণের মালধন গুটিয়ে কেবল একশ্রেণীর নিকট গিয়ে একত্রিত ও স্তুপীকৃত হতে থাকে। পরিশেষে তা পুরো সমাজেরই ধ্বংস ও বরবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এসব তিক্ত-অভিজ্ঞতার কথা জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতি বিষয়ে দূরদর্শীদের নিকট অবশ্যই অবিদিত নয়। সুদের এ সকল মন্দ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য।

সুদ ও ভাড়া বা মজুরীর মাঝে পার্থক্য

আমরা প্রথমেই একথা আলোচনা করেছি যে, সুদ অতিরিক্ত ও বাড়তি কিছুর নাম। পক্ষান্তরে মজুরীর আভিধানিক অর্থ হল 'সেবার বিনিময়ে দেয় পরিবর্ত বা অর্থ।' আর ভাড়া বলে (সাময়িক ব্যবহারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কালান্তরে দেয় অর্থ। অর্থাৎ) সেই নির্দিষ্ট মুনাফার মূল্যকে ভাড়া বলা হয়, যার উপর উভয়পক্ষ (ভাড়াদাতা ও গ্রহীতা) আপোসে চুক্তি করে নেয়। বুঝা গেল যে, মজুরী বা ভাড়া এবং মুনাফা (উপকার লাভ) এর মাঝে রয়েছে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। আল্লামা ইবনে কুদামা (রাহিমাহুল্লাহু) বলেন, 'ইজারাহ' 'আজ্‌র' মূলধাতু থেকে উৎপত্তি। যার অর্থ হল বিনিময় বা পরিবর্ত। এই অর্থেই সওয়াব বা নেকীকে 'আজ্‌র' বলা হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে বদলা বা মজুরী দান করেন।

এ থেকে পরিষ্কার হল যে, মজুরী বা ভাড়া সেই বিনিমেয় অর্থকে বলা হয়, যা বৈধ মুনাফা বা উপকার লাভের পরিবর্তে দেওয়া হয়। অবশ্য সে মুনাফা বা উপকার কোন ব্যক্তির সেবা বা পরিশ্রমের মাধ্যমে লাভ হবে অথবা এমন কোন ভোগ্য বা ব্যবহার্য জিনিসের মাধ্যমে লাভ হতে পারে যা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া সম্ভব; পরন্তু ব্যবহারের পর এ জিনিসের

আসল অবশ্যই বাকী থেকে যায়। এই দ্বিতীয় অর্থ থেকেই গৃহীত হয়েছে সুদকে বৈধ করার মতবাদ। এর সমর্থকরা এইভাবে প্রমাণ করে যে, সুদ হল ঋণগ্রহীতাকে দেওয়া টাকার ভাড়া, যে টাকা দ্বারা সে মুনাফা বা উপকার লাভ করে থাকে।

(অতএব বাড়ি বা অন্য কিছু ভাড়া দিয়ে যেমন তার ভাড়া বা কেরায়া খাওয়া বৈধ অনুরূপ টাকা খাটিয়ে তার সুদ গ্রহণও বৈধ।) সুতরাং সুদ ও ভাড়ার মাঝে নীতিগত পার্থক্য জানা আবশ্যিক। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সুদ ভাড়া বা মজুরী থেকে যে স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

১- মজুরী বা ভাড়া এবং সুদী ঋণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তাতে থাকে মজুর ও যে মজুর খাটায় এই উভয়েরই সম্পর্ক। অনুরূপ মজুরী এবং বাণিজ্যিক সুদের মাঝে পার্থক্য এটাও যে, মজুরীতে দু'টি মালের পরস্পর বিনিময় হয় না; বরং তাতে মাল অর্থাৎ মজুরী ও কাজ তথা মুনাফা বা উপকার বিনিময় হয়। (পক্ষান্তরে সুদে হয় মাল দিয়ে মালের বিনিময়।)

২- কোন জিনিস ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া এবং তার জন্য ভাড়া দেওয়ার শর্ত হল এই যে, ব্যবহার করার পর তার মূল ও আসল যেন নষ্ট হয়ে না যায়। যেমন আলোর জন্য মোমবাতি ভাড়া দেওয়া এবং তার উপর ভাড়া নেওয়া বৈধ নয়। আর দেওয়া টাকার মূল বা আসল (উপাদান) ঋণে অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য তার মূল্য অবশিষ্ট থাকে কিন্তু তার আসল (উপাদান) নষ্ট হয়ে যায়।[২১]

আমানত ও গচ্ছিত ধন

ফিক্হবিদগণ إيداع 'ঈদা' শব্দের সংজ্ঞা এরূপ করেছেন,

تسليط الغير على حفظ ماله.

অর্থাৎ নিজের মাল হিফাযতে রাখার উদ্দেশ্যে অপরকে ভারার্পণ করা।

আর وديعة (আমানত) সেই মালকে বলা হয় যা আমানতদারের নিকট (গচ্ছিত) রাখা হয়। বর্তমান কালের ব্যাংকে ডিপোজিট্ রাখা টাকা

[21] (বুনূক তিজারিয়্যাহ বিদূনি রিবা ১৬১-১৬৩ পৃঃ দ্রঃ)

শরয়ী অর্থে আমানত এই হিসাবে বলা হয় যে, ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা এই উদ্দেশ্যে জমা করে, যাতে তার টাকা হিফাযতে থাকে এবং প্রয়োজন সময়ে তা চাইবা মাত্র ফিরে পাওয়া যায়।

কিন্তু তা আমানত বললেও ব্যাংক তা ব্যবহার করে এবং নিজের অন্যান্য টাকার সাথে মিলিয়ে মুনাফা অর্জন করে; যা এক প্রকার তাসার্রুফ। আর এই তাসার্রুফের কারণেই আমানত তার শরয়ী অর্থ থেকে বের হয়ে যায় এবং ঋণ বা 'লোন্'এর পজিশনে অবস্থান্তরিত হয়। কারণ ঋণগ্রহীতার জন্য তার ঋণে গৃহীত অর্থে তাসার্রুফ করায় অধিকার আছে। যেমন সে অর্থ তার নিকট কোন প্রকারে নষ্ট হয়ে গেলেও সে তা আদায়ের জামিন থাকে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, আমানতকে ঋণে পরিবর্তিত করা বৈধ। যেমন করতেন যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর নিকট যখন কোন লোক নিজের মাল আমানত রাখতে আসত তখন তিনি বলতেন, 'আমানত নয়, বরং ধার হিসাবে আমি রেখে নিচ্ছি। কারণ এ মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি।'[২২]

সহীহুল বুখারী উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমানতের অর্থকে ঋণে পরিবর্তন করে নিতেন। আর তাঁর এই কর্মের উপর কোন সাহাবীও কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নি। কারণ তিনি এ মালওয়ালার অনুমতিক্রমেই সেই মাল বিনিয়োগ করে বৃদ্ধি করতেন।

বলাই বাহুল্য যে, ব্যাংকও টাকা আমানতকারীদের পুঁজি নিয়ে এ একই ধরনের আচরণ করে থাকে।[২৩]

আল্লামা মুহাম্মদ আমীন শানক্বীত্বী বলেন, 'ফিক্হ বিদ্গণের নিকট আমানত রাখার অর্থ হল, মাল হিফাযত ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য কোন অপর ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানিয়ে (দায়িত্বভার) দেওয়া। এবারে মালওয়ালার তরফ থেকে যদি এ প্রতিনিধির জন্য তা ব্যবহার করার অনুমতি থাকে, তবে তার দুই অবস্থা হতে পারে;

[22] (বুখারী, কিতাবু ফারযিল খুমুস, হাদীস নং ৩১২৯)

[23] (বুনূক তিজারিয়্যাহ বিদূনি রিবা ১৮৪-১৮৫ পৃঃ)

প্রথমতঃ এই যে, ব্যবহারের ফলে এ মালের আসল (উপাদান) নষ্ট হয়ে যায়। এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে, ব্যবহারের ফলে এ মালের আসল (উপাদান) নষ্ট হয়ে যায় না। সুতরাং ব্যবহারের ফলে যদি মালের আসল (উপাদান) নষ্ট না হয়, তবে তাকে عارية (বা সাময়িক ব্যবহার করতে) ধার বলে। পক্ষান্তরে যদি ব্যবহারের কারণে তার মূল (উপাদান) নষ্ট হয়ে যায়; যেমন টাকা পয়সা ইত্যাদি, তাহলে এই অবস্থায় প্রতিনিধির নিকট রাখা এ আমানতের মাল কর্জ বা ঋণে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অতএব ব্যাংকে জমা রাখা আমানত যে ঋণে দেওয়া টাকায় পরিণত হয়ে যায় তা পরিষ্কার হল। আর একথাও স্পষ্ট হল যে, আমানত ছাড়া যে অতিরিক্ত টাকা ব্যাংক জমাকর্তাকে দেয়, তা সূদ রূপে পরিগণিত।'[২৪]

এবারে আমরা পাঠকের খিদমতে এখানে 'ঋণ' কাকে বলে? ঋণের সংজ্ঞার্থ কি? এবং ঋণ কোন্ উদ্দেশ্যে নেওয়া-দেওয়া হয় তা পেশ করব। যাতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ সম্ভব হয়।

ঋণের সংজ্ঞা

ঋণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা করা হয়েছে,

دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

অর্থাৎ এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে কোন মাল (ধার) দেওয়া, যাতে সে (বর্তমানে) নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং পরে সে তার এ (দেনার) পরিবর্ত ফিরিয়ে দেয়।

কর্জ বা ঋণ লেন-দেন করার সময় ঋণের নির্দিষ্ট পরিমাণ, তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য (কোয়ানটিটি ও কোয়ালিটি) জেনে রাখা একান্ত জরুরী।

সমাজের মানুষের সুবিধার্থে ইসলামী শরীয়তে কর্জ নেওয়া-দেওয়াকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ঋণ ব্যবস্থা অর্থ উপার্জনের কোন প্রকার অসীলা বা উপায় বলে বিবেচিত নয় এবং নিজের মাল বৃদ্ধি করার পথসমূহের মধ্যে কোন (বৈধ) পথও নয়। তাই তো ঋণ দেওয়ার পর ঋণগ্রহীতাকে কেবল সেই পরিমাণ মালই পরিশোধ করতে হয় যে পরিমাণ

[24] (দিরাসাহ শারইয়্যাহ ২৭১-২৭২ পৃঃ)

মাল সে ঋণদাতার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। নতুবা তাকে এ নেওয়া মালের অনুরূপ মাল ফেরৎ দিতে হয়। তার চেয়ে অধিক মাল কোনক্রমেই ফেরৎ দিতে হয় না।

কারণ ফিক্হের নীতিগত আইন এই যে,

أي قرض جر منفعا فهو ربا.

অর্থাৎ, যে ঋণ কোন প্রকার মুনাফা আনয়ন করে তা (এ মুনাফা) সুদ বলে গণ্য।

তবে হ্যাঁ, ঋণের উপর এ মুনাফা কেবল তখনই ঋণদাতার জন্য হারাম ও সুদ বলে বিবেচিত হবে, যখন ঋণ দেওয়ার সাথে এ মুনাফা দেওয়ার শর্ত ও চুক্তি আরোপ করা হবে। অথবা এমন দেওয়া-নেওয়া তাদের মাঝে পরিচিত থাকবে।[২৫]

নচেৎ যদি ঋণের উপর এ মুনাফার শর্ত আরোপ করা না হয় অথবা তাদের মাঝে এরূপ লেনদেন পরিচিত না হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে তার ঋণ পরিশোধের সময় সুন্দর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেওয়া বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু প্রদান করতে পারে।

আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট যখন সদকার উট এল, তখন তিনি এ লোকটির উটের বাচ্চা পরিশোধ করতে আমাকে আদেশ করলেন। আমি বললাম, 'উটগুলোর মধ্যে সবগুলোই বড় বড় উট, উটের কোন বাচ্চা ওদের মধ্যে নেই।'

তখন নবী করীম ﷺ বললেন,

أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.

অর্থাৎ, এ বড় উটই দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে (ঋণ) পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।"[২৬]

[25] অর্থাৎ ঋণ নিলে অতিরিক্ত দিতে হয় তা তাদের মাঝে প্রচলিত থাকলে নতুনভাবে শর্ত আরোপ না করলেও সুদ বলে গণ্য। তদনুরূপ ঋণ দেওয়ার পর ঋণগ্রহীতার তরফ থেকে বিভিন্ন হাদিয়া উপঢৌকন, উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করাও সূদের পর্যায়ভুক্ত।

[26] (মুসলিম ৫/৪৫, হাদীস নং ১৬০০, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী আবু হুরাইরা কর্তৃক বিভিন্নসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন, দেখুন, বুখারী ৩য় খন্ড ২৫৩ পৃঃ, হাদীস নং ২৩০৫, মুসলিম ১৬০১ নং)

কর্জ ও ঋণের উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যাংক সুদের উপর যে ঋণ দেয় ও নেয় তা অবৈধ। সুতরাং আবশ্যক হল (ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকরণ এবং) ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক লোকেদের সুবিধার্থে বিনা সুদে ঋণ প্রদান। (আল বুনূকুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান নাযারিয়্যাতি অত্‌তাত্ববীক্ব ১১৭পৃঃ)

সূদ প্রতিহত করার বিভিন্ন পদ্ধতি

ইসলাম যখন কোন বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে, তখন সেই বস্তুর কাছে পৌঁছে দেয় এমন সকল প্রকার রাস্তা উপায়, উপকরণ, অসীলা ও ছিদ্রপথকেও এক সঙ্গে বন্ধ করে দেয়। বরং যে স্থান হতে সেই বস্তুর প্রতি যাওয়ার জন্য উদ্যোগ শুরু হয় সেই স্থানেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেয়। যাতে মানুষ তার নিকটেও পৌঁছতে না পারে।

বলা বাহুল্য, ইসলাম প্রত্যেক সেই জিনিসকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে যা মুসলিমকে সূদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং যা সূদের অসীলা ও ছিদ্রপথ। আমরা নিম্নে এমন কয়েকটি জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যাকে সূদের উপায় ও পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম নিষিদ্ধ বর্ণনা করেছেঃ-

১- রিবাল ফায্‌লঃ

একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের হাতে-হাতে লেন-দেনের সময় অথবা দুই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের ধারে লেন-দেনের সময় যে অতিরিক্ত ও বাড়তি অংশ নেওয়া-দেওয়া হয় তাকে 'রিবাল ফায্‌ল' বলা হয়।

সেই সকল প্রকার বস্তু রিবাল ফাযলের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে, যাতে সেই কারণ পাওয়া যায় যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত ছয়টি জিনিসে পাওয়া যায়। আর ছয়টি জিনিস হল, সোনা, চাঁদি, গম, যব, খেজুর এবং লবণ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন, 'ইসলাম সূদের পথ বন্ধ করার জন্যই রিবাল ফায্‌লকে হারাম চিহ্নিত করেছে। কারণ এতে ঋণ ভিত্তিক সূদ খাওয়ার আশঙ্কা বর্তমান। আর তা এই জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করবে, তখন ধীরে ধীরে

নগদ কারবার অতিক্রম করে ধারেও এ রূপ কারবার শুরু করতে প্রয়াস পাবে; যাকে মহাজনী (ঋণী) কারবার বলা হয়। আর উক্ত কারবার সূদখোরীর একান্ত নিকটতম অসীলা। এই জন্যই যুক্তির নিক্তিতে সমীচীন এটাই ছিল যে, সূদের সকল দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হোক এবং এক দিরহামের বিনিময়ে হাতে-হাতে অথবা ধারে উভয় প্রকার বেচা-কেনা নিষিদ্ধ করা হোক। আর এ যুক্তি বিবেকের কষ্টিপাথরেও যথার্থ; যার ফলে ফাসাদ ও বিপত্তির সকল দুয়ার ও ছিদ্রপথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

আর এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বেচা-কেনার প্রয়োজন তখন পড়ে, যখন উভয় দিরহামের মধ্যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যগত কোন পার্থক্য বিদ্যমান থাকে; যেমন একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং অপরটি নিম্নশ্রেণীর অথবা একটি হালকা এবং অপরটি ভারী ইত্যাদি।[২৭]

উক্ত প্রকার কারবার হারাম করার মানসে উবাদাহ বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এক হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملـــح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعـــوا كيـــف شئتم إذا كان يداً بيد.

অর্থাৎ, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুকে যেমনকার তেমন, সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। অবশ্য যখন উভয় বস্তুর শ্রেণী বা জাত বিভিন্ন হবে, তখন তোমরা তা যেভাবে (কমবেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর; তবে শর্ত হল, তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়।" (মুসলিম, মিশকাত ২৮০৮ নং) সুতরাং বুঝা গেল যে, একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসকে একটিকে অপরের বিনিময়ে হাতে হাতে অথবা ধারে কমবেশী করে বেচা-কেনা হারাম। অবশ্য উভয় জিনিসের শ্রেণী ও জাত ভিন্ন ভিন্ন হলে নগদ ক্রয় বিক্রয় বৈধ। নচেৎ ধারে হলে তাও অবৈধ।[২৮]

---

[27] (ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৩০, তাহক্বীক আব্দুর রহমান অকীল)

[28] অতএব দৃষ্টান্তস্বরূপ ৫ কেজি বীজ ধানের বিনিময়ে ৭ কেজি সাধারণ ধান, বেশী ওজনের পুরাতন সোনা বা রূপার অলঙ্কারের বিনিময়ে কম ওজনের নতুন অলঙ্কার দেওয়া-নেওয়া এ সূদের পর্যায়ভুক্ত।

২- সুদখোরের নিকট চাকুরী করা অথবা সুদের কোন প্রকার সহায়তা করাঃ-

সুদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম যে সব উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তার মধ্যে এক পদ্ধতি এই যে, সুদকে যেমন হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে তেমনি তার সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতাকেও হারাম ও নিষিদ্ধ জারী করেছে। সুতরাং সূদ নেওয়া যেমন হারাম তেমনি দেওয়াও হারাম। (অবশ্য নিরুপায় অবস্থার কথা ভিন্ন।) অনুরূপ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সেই কর্ম করাকেও হারাম বলা হয়েছে যে সব কর্মে বা কর্মক্ষেত্রে সূদী কারবার আছে। অতএব সুদী খাতা-পত্র লেখক, হিসাবরক্ষক, সুদীকারবারের সাক্ষ্যদাতা প্রভৃতিও এ সুদখোরের মত সমান গোনাহরই ভাগী।

এ কথা হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে এইরূপ এসেছেঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاء.

অর্থাৎ, "আল্লাহর রসূল ﷺ সুদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষীকে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, ওরা (পাপে) সকলেই সমান।"[২৯]

এই অভিশাপ ও পাপে তারাও শামিল হবে, যারা তাদের বিল্ডিং, বাড়ি বা দোকান সুদীকারবারে জড়িত কোন ব্যক্তি, কোম্পানী অথবা সুদী ব্যাংককে ভাড়া দিয়ে থাকে। আর তারাও এর আওতাভুক্ত যারা অনুরূপ সুদী ব্যাংকে নিজেদের টাকা-পয়সা জমা রাখে---যদিও তারা সুদ নেয় না বা খায় না। (নিরুপায় অবস্থায় চোর-ডাকাতের ভয়ে ব্যাংকে টাকা রাখতেই হলে তার নির্দেশ ..... পৃষ্ঠায় দেখুন।)

৩- ঋণ দেওয়ার ফলে কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করাঃ- সুদের প্রবেশপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে নবী করীম ﷺ মুসলমানদের উপর

সুতরাং এসব ক্ষেত্রে পুরাতন বিক্রয় করে তার দাম হাতে নিয়ে তারপর এ টাকা দিয়ে নতুন অলঙ্কার কেনা জরুরী।

তদনুরূপ ২ কিলো গম দিয়ে ২ অথবা ১ কিলো চাল হাতে হাতে নগদ বেচা-কেনা বৈধ; ধারে নয়। সুতরাং ভাদ্রমাসে ১ কিলো গম দিয়ে পৌষমাসে ১ বা দেড় কিলো চাল নেওয়া উক্ত সূদ খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত।---অনুবাদক

[29] (মুসলিম, মিশকাত ২৮০৭ নং)

সেই সমস্ত মুনাফা ও উপকার গ্রহণকেও হারাম ঘোষণা করেছেন, যা ঋণ দেওয়ার ফলে ঋণগ্রহীতার নিকট পেশ করা হয়ে থাকে।

যেমন কোন উপহার-উপঢৌকন অথবা বিনা মজুরীতে ঋণদাতার কোন কাজ করে দেওয়া প্রভৃতি (যদিও ঋণগ্রহীতা এ সবের মাধ্যমে উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার করতে চায়, তবুও ঋণদাতার জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।) হাদীস শরীফে প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (কাউকে) ঋণ দেয়। অতঃপর (ঋণগ্রহীতার তরফ থেকে) তাকে কোন উপঢৌকন দেওয়া হয় অথবা তাকে (ঋণগ্রহীতা নিজের গাড়ি বা) সওয়ারীতে চড়িয়ে কোথাও পৌঁছিয়ে দিতে চায়, তবে সে যেন তার সওয়ারীতে না চড়ে এবং তার উপঢৌকনও গ্রহণ না করে। তবে হ্যাঁ, যদি এরূপ সদ্ব্যবহার (উপঢৌকন আদান-প্রদান ঋণ দেওয়ার) পূর্ব থেকেই জারী থাকে তবে (তার পরে) অনুরূপ কিছু গ্রহণ করায় দোষ নেই।"[৩০]

[30] (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৪৩২, মিশকাত ২৮৩১ নং) আলোচ্য হাদীসটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রভৃতির নিকট হাসান। কিন্তু আল্লামা আলবানীর নিকট যয়ীফ। অবশ্য ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁর ফতোয়ায় এ হাদীসের সমর্থনে একাধিক আসার (সাহাবার উক্তি) পেশ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন, 'সুতরাং নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাবর্গ ঋণদাতাকে ঋণপরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীতার হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এ হাদিয়া পেশ করার মতলব হল ঋণ পরিশোধের মেয়াদ পিছিয়ে দিতে বলা যদিও সে এর শর্ত আরোপ করে না এবং মুখে প্রকাশ করে সে কথা বলে না। সুতরাং এরূপ করা সেই ব্যক্তির অনুরূপ হবে, যে এক হাজার নিয়ে তার বিনিময়ে নগদ হাদিয়া ও বিলম্বিত এক হাজার ফেরৎ দেয়। আর এমন কাজ অবশ্যই সুদ। পক্ষান্তরে ঋণ পরিশোধের সময়ে নেওয়া অর্থ থেকে উপহার হিসাবে কিছু বেশী দেওয়া এবং পরিশোধের পর ঋণদাতাকে কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে (উপকারের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা) ঋণগ্রহীতার জন্য বৈধ।

যেহেতু এতে সুদের অর্থ বর্তমান থাকে না।' আল্লামা আলবানী উক্ত উক্তির টিপ্পনীতে বলেন, 'অবশ্যই এটা ফকীহর কথা। তবে আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয় হল উক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থ।' (আর তা যয়ীফ। দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফাহ ৩/৩০৩-৩০৭, হাদীস নং১১৬২, যয়ীফ ইবনে মাজাহ ৫২৯নং, ইরওয়াউল গালীল ১৪০০ নং) এ মর্মে আবু বুরাইদা বিন আবু মূসা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি (ইরাক হতে) মদীনায় এলাম এবং আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর (কথা প্রসঙ্গে) তিনি বললেন, 'তুমি এমন এক দেশে আছ যেখানে সুদ ব্যাপক আকারে প্রচলিত। সুতরাং তুমি কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু ঋণ দিয়ে থাকলে সে যদি তোমাকে

উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মুনাফা ও উপকার গ্রহণ করতেও নিষেধ করেছেন যা ঋণ দেওয়ার কারণেই ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার জন্য নিবেদন করতে চায়।

৪- চাষাবাদ ও ক্রয়-বিক্রয়ের কতক নিষিদ্ধ পদ্ধতি ঃ-

সুদের মূলোৎপাটন সাধন এবং তার সকল প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করার মানসে ইসলাম চাষাবাদ ও বেচা-কেনার কিছু পদ্ধতি ও রীতিকেও নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে। যেমন;

ক- মুখাবারাহ ; ভাগচাষীকে জমি ভাগে চাষ করতে দিয়ে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ মালিকের জন্য নির্ধারিত করে নেওয়া, জমি বা খেতের বিশেষ বিশেষ গাছ ও তার ফসল অথবা জমির বিশেষ কোন একটা দিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া।[৩১]

খ- মুযাবানাহঃ- গাছে ধরে থাকা খেজুরকে পাকা খেজুর দ্বারা বিক্রয় করা।

গ- মুহাক্বালাহঃ- খেতে ধরে থাকা কাঁচা শস্যকে পাকা ফসলের বিনিময়ে ক্রয় করা। (অনুরূপ ফল-ফসল পাকার পূর্বে বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ।) আল্লামা ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই শ্রেণী এবং এই ধরণের অন্যান্য শ্রেণীর লেন-দেনকে এই জন্যই হারাম করা হয়েছে; যাতে সূদের কারবার সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। কারণ, শুষ্ক হওয়ার পূর্বে বিনিময়ে উভয় ফল বা শস্যের পরিমাণ-সমতা বুঝা যায় না। এই জন্যই ফিক্হবিদগণ বলেছেন,

---

উপঢৌকনস্বরূপ এক বোঝা গমের কাঁচকি, অথবা এক বোঝা যব অথবা এক বোঝা (গবাদি পশুর খাদ্য লূস্যার্ন) পাতা দিতে আসে তাহলে তা গ্রহণ করো না। কারণ তা সূদ!' (বুখারী ১৮১৪ নং, মিশকাত ২৮৩৩ নং)

ঋণ নেওয়ার পরে ঋণদাতার অনুগ্রহের প্রতিদান প্রকাশার্থে ঋণদাতাকে কোন জিনিস সঠিক দামের চেয়ে কমদামে বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেওয়া এবং ঋণদাতার তা নেওয়া সূদের পর্যায়ভুক্ত। (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৯/৪৪১) -অনুবাদক

31 এ বিষয়ে বৈধ পথ হল সমস্ত ফসলকে শতকরা হারে ভাগাভাগি করা। যেমন, আধাআধি, তিন বা চারভাগের ভাগ ইত্যাদি। অনুরূপ নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে জমি ঠিকে বা ভাড়া দেওয়া বৈধ। অনুরূপ গাড়ি বা রিক্সার মালিক ড্রাইভারকে চালাতে দিয়ে দৈনিকহারে নির্দিষ্ট টাকা প্রত্যহ আদায় করা বৈধ নয়। কারণ, এতে উভয় পক্ষেরই ধোঁকার আশংকা থাকে। সুতরাং বৈধ পথ হল, প্রত্যেক দিনের ভাড়ার নির্দিষ্ট পার্সেন্টটেজ ভাগাভাগি করা। আসল টাকা ড্রাইভার গোপন করলে সে পাপ তার। -অনুবাদক

الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.

অর্থাৎ, "বিনিময়ে (একই শ্রেণীভুক্ত) দুটি বস্তুর পরিমাণ-সমতা অজ্ঞাত হলেই তা প্রকৃত সূদের ন্যায় (কারবার।)[৩২]

৫- সূদ খাওয়ার জন্য ছল ও বাহানা খোঁজা ঃ-

সূদের সকল প্রকার পথ ও দুয়ার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম সূদ খাওয়ার জন্য কোন প্রকার ছল, ছুতা বা বাহানা করা অথবা তার জন্য কোন প্রকার ফন্দি ও কৌশল অবলম্বন করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, বরং কোন প্রকারের হারামকে হালাল করতে ছলবাজী করাকেও হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের উপর গরু-ছাগলের চর্বিকে হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা বৈধ করে খাওয়ার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করল; এ সকল চর্বিকে গলিয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য খেতে শুরু করেছিল।

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.

অর্থাৎ, "আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেছিলেন তখন ওরা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছিল।"[৩৩]

আল্লামা ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের কোন ব্যাপারেই কোন প্রকার ছল-বাহানা বৈধ নয়।'[৩৪]

অতঃপর তিনি বাহানার এই সংজ্ঞা করেন, 'বাহানা হল, বাহ্যতঃ বৈধ চুক্তি বা লেন-দেন করা অথচ উদ্দেশ্য থাকে এর পশ্চাতে চাতুরী ও প্রতারণার সাথে অবৈধ চুক্তি বা লেনদেন করা, অথবা হারামকে হালাল করা, অথবা ওয়াজেব চ্যুত করা, অথবা কোন হক রদ্ করা।'

---

32 (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৫৮১)

33 (বুখারী, হাদীস নং ২২৩৬, মুসলিম ১৫৮১নং, নাসাঈ ৪৬৮৩, মুসনাদে আহমদ ১/২৫ প্রমুখ)

34 (মুগনী ৪/৬৩)

সূদ খাওয়ার কতিপয় নয়া পদ্ধতি

সূদ খাওয়ার বহু ধরনেরই বাহানা ও পথ রয়েছে যা গণনা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক যুগেই সূদখোর লোকেরা সুদ খাওয়ার নিত্যনতুন পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর শরীয়তকে ধোঁকা দিতে প্রয়াস পেয়েছে। এই ধরনের কিছু পথ ও পদ্ধতির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছিঃ-

১- বাই-এ ঈনাহঃ-

এই ব্যবসার পদ্ধতি এই যে, এক ব্যক্তি কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদ দিয়ে ধারে বিক্রয় করে, অতঃপর সেই জিনিসকেই নগদে তার থেকে কম দামে ক্রয় করে। (যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হল। ঋণ কোথাও না পেয়ে এক গাড়ির ডিলারের নিকট গেল। ডিলারের নিকট থেকে ধারে ৫০ হাজার টাকায় একটি গাড়ি কিনল। অতঃপর সেই গাড়িকেই ঐ ডিলারের নিকট নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে বিক্রি করল। যার ফলে ১০ হাজার টাকা ডিলারের পকেটে অনায়াসে এসে গেল।)

সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে সূদী কারবার বলে আখ্যায়ন করেছেন। উক্ত উলামাবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ ও কুরতুবী প্রমুখ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ লিখেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হল যে, এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ দিয়ে হারীরাহ (আটা ও দুধ দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য) ধারে বিক্রয় করল। অতঃপর সে তা অপেক্ষাকৃত কম দামে খরিদ করে নিল। (এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি?) উত্তরে তিনি বললেন, 'সে তো দিরহামকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে, হারীরাহ কেবল উভয়ের মাঝে এসে গেছে।' (আর বিদিত যে, দিরহামকে দিরহামের বদলে কমবেশী করে ক্রয়-বিক্রয় হারাম বা সূদ।)

অনুরূপ একই বিষয়ে আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এরূপ করা সেই ক্রয়-বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম ঘোষণা করেছেন। আর এই অভিমতই অধিকাংশ উলামা; ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ (রঃ) প্রমুখগণের।

এঁদের নিকটেও উক্ত লেন-দেন হারাম ও নাজায়েয।[৩৫]

২- তাওয়ার্রুক ব্যবসাঃ-

১০০ টাকার জিনিসকে ১২০ টাকায় ধারে কিনে তা ব্যবহার করা অথবা তা অল্পদরে অন্যের নিকট বিক্রি করে তার মূল্য ব্যবহার করাকে মাসআলা-এ তাওয়ার্রুক বলা হয়। (যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হলে ঋণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও ঋণ না পেলে সে কোন গাড়ির দোকানে গেল। সেখানে ৫০ হাজার টাকা দামের গাড়ি ৬০ হাজার টাকায় ধারে কিনে তা ৪০ বা ৫০ হাজার টাকায় অন্য ব্যক্তিকে নগদ বিক্রয় করে সে পয়সা কাজে লাগাল।

অথবা গাড়ির প্রয়োজনে এভাবে গাড়ি নিয়ে তা ব্যবহার করল। এমন লেনদেনকে তাওয়ার্রুক বলে।[৩৬]

বহু উলামার নিকট উক্ত প্রকার লেন-দেন সূদের পর্যায়ভুক্ত। উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, 'তাওয়াররুক হল সূদের ভাই।'[৩৭]

৩- দুই ব্যবসায়ীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতাঃ-

উক্ত ব্যবসা এই রূপ যে, ঋণদাতা ও গ্রহীতা নির্দিষ্ট টাকার কোন সুদী কারবারে চুক্তিবদ্ধ হয়। অতঃপর উভয়ে বাজারে কোন দোকানদারের নিকট এসে চুক্তি পরিমাণ টাকার পণ্য ঋণদাতা খরীদ করে নেয়। অতঃপর সে ঋণগ্রহীতার নিকট উক্ত পণ্য ধারে বিক্রয় করে। পুনরায় ঋণগ্রহীতা এ পণ্য ঘুরে দোকানদারকে কমদরে বিক্রয় করে। এইভাবে দোকানদার এই সূদী কারবারে মধ্যস্থতা করে। টাকা পরিশোধের সময় বেশী পায়

---

[৩৫] (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/৪৪৬) ; এ প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন তোমরা ঈনাহ ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" (মুসনাদে আহমদ ২/২৮,৪২, ৮৪, আবু দাঊদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)

[36] (আশ্ শারহুল মুমতে ৮/২৩১)

[37] বর্তমান বিশ্বের সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের নিকট তাওয়ার্রুক কিছু শর্তে বৈধ। প্রথমতঃ এ ব্যক্তি ঋণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও সত্যিই যদি ঋণ না পায়। দ্বিতীয়তঃ সে যদি সত্যসত্যই টাকা বা এ জিনিসের অভাবী হয়। তৃতীয়তঃ যে জিনিস বিক্রয় হচ্ছে তা যেন বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় বিক্রয় হয়। (দেখুন, আশ্ শারহুল মুমতে, ইবনে উসাইমীন ৮/২৩৩, আল মুদায়ানাহ ৭ পৃঃ, কিতাবুদ্দা'ওয়াহ ইবনে বায ১৮৮ পৃঃ) -অনুবাদক

ঋণদাতা। মাঝখান থেকে মধ্যস্থতার নামে লাভ হয় দোকানদারেরও। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'এ কারবার সূদী কারবারের পর্যায়ভুক্ত।'[৩৮] শায়খ ইবনে উসাইমীন বলেন, 'এ কারবার নিঃসন্দেহে হারাম।'[৩৯]

৪- ঋণ পরিশোধ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হলে ঋণকে ব্যবসায় পরিণত করা ঃ- তা এই রূপে যে, ঋণ পরিশোধ করার নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং ঋণ গ্রহীতা তা পরিশোধ না করতে পারলে ঋণদাতা অধিক অর্থ নিয়ে এ ঋণকে অন্য কারবারে পরিবর্তন করে দেয়। এরূপ করা সূদ খাওয়া। যার হারাম হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।[৪০]

সূদের অপকারিতা

প্রিয় পাঠক! এবারে আসুন আমরা সমীক্ষা করে দেখি যে, ইসলাম কেন সূদকে নিষিদ্ধ ও কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে? সূদের মধ্যে কি এমন ক্ষতি, অপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা আছে? মানুষের চরিত্রে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সারা বিশ্বে কি এমন মন্দ প্রভাব ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সূদে? যার প্রেক্ষিতে না তো সূদ কোন বিবেক ও যুক্তিসম্মত। না তা ন্যায়পরায়ণতার অনুকূল। আর না-ই তা জীবন-জীবিকার কোন অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় লেন-দেন।

এক্ষণে আমরা এ অভিশপ্ত বস্তুর বিভিন্ন দিক থেকে তার অনিষ্টকারিতা ও সর্বনাশিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সমীক্ষা করব। যাতে কোন জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এই নাপাক বস্তুর

[38] (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৯/৪৪১)

[39] (আল- মুদায়ানাহ ৮পৃঃ)

[40] প্রকাশ যে, কারো জিনিস বন্ধক রেখে ঋণ দিয়ে এ জিনিস ব্যবহার করা বৈধ নয়। বৈধ নয় জমি বন্ধক নিয়ে ধান খাওয়া। বন্ধক নিয়ে জমির মালিক হওয়া যায়না। তবে তার সম্পূর্ণ ফসল কি করে হালাল হবে? সুতরাং জমি বন্ধক নিয়ে তার চাষ যদি ঋণদাতাই করে তাহলে জমির মালিকের সাথে একটা ভাগচুক্তি করে করাই হারাম থেকে বাঁচার পথ। অবশ্য গাই বন্ধক নিলে যেহেতু তাকে খাওয়াতে হবে সেহেতু তার দুধপান করা বৈধ। (দ্রষ্টব্য, ফিকহুস সুন্নাহ ৩/১৭১)

অবৈধতার ব্যাপারে অণু পরিমাণও কোন সন্দেহ ও দ্বিধা অবশিষ্ট না থাকে।

সূদের চরিত্রগত ও নৈতিক ক্ষতি

সচ্চরিত্র ও আত্মা মানবতার মৌলিক উপাদান। আমাদের এই উপাদানে যা ক্ষতিসাধন করে তা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য; চাহে তার অন্যান্য উপকারিতা যতই বর্ণনা করা হোক না কেন। এখন যদি আপনি সূদের মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন তাহলে বিদিত হবেন যে, অর্থ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সূদী কারবারের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থান্তরে পূর্ণ মানসিক আচরণ স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণমনতা, নির্মমতা এবং অর্থপরায়ণতার মত হীনগুণের কুপ্রভাবের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত থাকে। সূদী কারবারে মানুষ যত অগ্রসর হতে থাকে উক্ত অসৎ গুণাবলী তার মধ্যে ততই প্রতিপালন ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে ঠিক এর বিপরীত; সদকাহ এবং যাকাত প্রদানের প্রাথমিক নিয়ত থেকে শুরু করে আমলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অবস্থায় মানুষের মানসিক আচরণ সম্পূর্ণ দানশীলতা, বদান্যতা, ত্যাগ, উৎসর্গ, সহানুভূতি, উদারতা ও উচ্চমন্যতার মত সদ্‌গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। আবার এই সৎকর্মের উপর আমল করতে থাকলে উক্ত প্রকার সুগুণগুলিও মানুষের মাঝে ক্রমোন্নতি ও বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এক্ষণে আপনার হৃদয় ও মন কি সাক্ষ্য দেয় না যে, উপরোক্ত উভয়প্রকার চারিত্রিক গুণাগুণ-গুচ্ছের মধ্যে প্রথম গুচ্ছ হল নিকৃষ্ট এবং দ্বিতীয়টি উৎকৃষ্ট ?

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি

যে সমাজের সদস্যরা পরস্পর স্বার্থপরতাপূর্ণ ব্যবহার করে; নিজ নিজ স্বার্থ ও লাভ ছাড়া কেউ কারো কাজে না আসে এবং একজনের অভাব ও অর্থ প্রয়োজন দেখা দিলে অপর জনের মুনাফা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ হয়, এমন নির্মম সমাজ কোনদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং সে সমাজ চিরকালের জন্য বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের দিকে ঝুঁকে যায়। ঠিক এর বিপরীত যে সমাজের সমাজ-ব্যবস্থা আপোসে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের

ভিত্তিতে পরিচালিত, যার সদস্যগণ পরস্পর দানশীলতার সহিত সদ্ব্যবহার করে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের অভাব-অনটনের সময় উদারচিত্ত ও মন নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকে সেই সমাজে বৃদ্ধি পায় সম্প্রীতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা। আর এমন সমাজে পরস্পর সহযোগিতা এবং পরহিতৈষার ফলে উন্নয়নের গতি প্রথম সমাজের তুলনায় অধিক দ্রুততর হয়।

অনুরূপ এই কথা এক জাতির সহিত অপর জাতির (আন্তর্জাতিক) সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রাখার ক্ষেত্রেও বলা যায়; অর্থাৎ এক জাতি যদি অপর জাতির সাথে বদান্যতা ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার প্রদর্শন করে এবং তার বিপদ-আপদের সময় উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ায়, তাহলে এ সম্ভবই নয় যে, দ্বিতীয় তরফ হতে এর প্রতিদানে সম্প্রীতি, কৃতজ্ঞতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য দুর্ব্যবহার প্রদর্শিত হবে। পক্ষান্তরে এ একই জাতি যদি নিজের প্রতিবেশী আর এক জাতির সাথে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণমনতা-পূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে এবং তার বিপদ সমস্যার সময়কে নিজের স্বার্থলাভের সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহার করে, তাহলে এ কোন প্রকারেই সম্ভব নয় যে, সেই স্বার্থপর জাতির জন্য এ জাতির হৃদয়ে কোন প্রকার সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং পরহিতৈষণা অবশিষ্ট থাকবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা, বৃটেন আমেরিকার নিকট একটা মোটা অঙ্কের অর্থ-ঋণ নেওয়ার চুক্তি করেছিল। আমেরিকা এ যুদ্ধে বৃটেনের মৈত্রীবদ্ধ ছিল; তাই বৃটেন আশা করল যে, আমেরিকা তাদেরকে বিনা সূদে ঋণ প্রদান করবে। কিন্তু আমেরিকা সূদ ছাড়তে রাজী হলো না। ফলে বৃটেন অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে সূদ দিতে চুক্তিবদ্ধ হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ইংরেজ জাতির উপর রেখাপাত করেছিল সে কথা তদানিন্তন অর্থমন্ত্রী ডক্টর ডালটনের কথায় এইরূপ ছিল,

'এই ভারী বোঝা যা বহন করা অবস্থায় আমরা যুদ্ধ থেকে বের হয়ে আসছি এটি আমাদের অসাধারণ ত্যাগ ও কষ্টের বড় চমৎকার প্রতিদান যা আমরা এক যৌথ উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্বীকার করে এসেছি।'

এই হল সূদের স্বাভাবিক প্রভাব এবং তার অনিবার্য মানসিক প্রতিক্রিয়া যা সর্বদা পরিস্ফুট হতে থাকবে; তাতে এক জাতি অপর জাতির

সাথে এরূপ আচরণ করুক অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করুক; সর্বাবস্থায় প্রতিক্রিয়া একই শ্রেণীর।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক দিয়েও সূদের অপকারিতা এত বেশী যে, রাজনীতিবিদ্ এবং অর্থনীতিজ্ঞ বড় বড় পন্ডিতগণ এ কথা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সারা বিশ্ব আজ যে সকল সংকটের সম্মুখীন তার পশ্চাতে রয়েছে সূদের হাত। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে, বিশ্বের অর্থ-ব্যবস্থা কখনই সফলতা অর্জন করতে পারে না; যদি না সূদী কারবারকে শূন্যের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়; অর্থাৎ সূদকে তার মূল ও বুনিয়াদ থেকে নির্মূল করে উৎখাত না করা পর্যন্ত অর্থনৈতিক সফলতা আদৌ সম্ভব নয়।

এক অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ সত্যই বলেছেন, সূদ অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে 'এড্স' এর মতই; যে তার প্রতিকার-ক্ষমতায় ঘুণ ধরিয়ে দেয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস ও বিনাসের অতল-গর্ভে তলিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য সেই আমেরিকা, যে পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা বড় পতাকাধারী এবং প্রধান সমর্থক সে বর্তমানে ভীষণভাবে অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হয়ে পড়েছে। আমেরিকা সংবাদ-সংস্থা এই খবর প্রকাশ করেছে যে, আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা বর্তমানে ১২ মিলিয়ন থেকেও বেশীতে গিয়ে পৌঁছেছে। সন ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ২৫৩০০ থেকেও বেশী কোম্পানী নিজেদের দেউলিয়া হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আর জার্মানে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮২ সনে অর্থনৈতিক বাজার মন্দা তথা মুদ্রাস্ফীতির কারণে নিরিখ বা বাজার দর ১১.৯১৬ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যা ১৯৮১ সনের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশী![৪১]

জেফরী মার্ক তাঁর 'আধুনিক পৌত্তলিকতা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ কথা সংযোজন করা জরুরী মনে করি যে, সেই সকল ঐতিহাসিকগণ যাঁরা সূদী

[41] (আর রিবা, উমার আশকার ১২৯-১৩০ পৃঃ)

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অভিনব গণতন্ত্রের স্বার্থে ইতিহাস রচনা করেন তাঁরা এই ঘটনাটিকে মিথ্যা রটনায় পরিণত করেছেন।'

যে মিথ্যা রটনার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তা হল (ফরাসী বীর সম্রাট) নেপোলিয়ন বেনোপার্টের পরাজয়। বলা বাহুল্য লেখক যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তা হল এই যে, নেপোলিয়নকে যে শক্তি পরাজয়ের শিকার করেছিল, তা হল কেবলমাত্র সূদখোরদের আধিপত্য ও ক্ষমতাশীল প্রভাব।[৪২]

আসুন এবার আমরা সমীক্ষা করে দেখি যে, সূদের অর্থনৈতিক অপকারিতা কি কি?

সাধারণতঃ ঋণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

১- কিছু ঋণ যা, অভাবী লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করে থাকে।

২- কিছু ঋণ, যা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সওদাগরগণ নিজেদের মুনাফাজনক কাজে খাটাবার জন্য নিয়ে থাকে।

৩- কিছু ঋণ, যা সরকার নিজের দেশবাসীর নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। যা যুদ্ধের সময় অথবা রেলপথ, বিদ্যুৎ-পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যকর করার নিমিত্তে তা গ্রহণ করা হয় ।

৪- কিছু ঋণ, যা সরকার নিজের প্রয়োজনে কোন অন্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে নিয়ে থাকে।

এবার আমরা প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক-পৃথক সমীক্ষা করে দেখব যে, সূদ আরোপিত হওয়ার পর কি কি ক্ষতি তাতে নিহিত রয়েছেঃ-

১- অভাবী লোকেদের ঋণ ঃ

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী যে কারবারের মাধ্যমে সূদ লেন-দেন হয়, তা হল মহাজনী কারবার (LENDING BUISNESS)। এই আপদ কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একটি বিশ্বব্যাপী আপদ; যে আপদ থেকে কোন দেশই মুক্ত নয়। এর কারণ এই যে, গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের নিজ প্রয়োজনে সহজভাবে ঋণ লাভের ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন স্থানেই নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক দেশেরই মজুর,

[42] (আর রিবা, ডক্টর উমর আশকার ১৪২-১৪৩ পৃঃ)

চাষী, ছোট-খাটো কারবারী, ব্যবসায়ী এবং অল্প বেতনভুক চাকুরীজীবি মানুষেরা বাধ্য হয়েই নিজেদের দুর্দিনের সময় ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু উক্ত মহাজনী কারবারে সূদের হার এত বেশী আকারে প্রচলিত যে, যখনই কোন ব্যক্তি একবার এসে এ সূদী ঋণের জালে ফেঁসে যায়, তখন সে আর নিজেকে সেখান হতে উদ্ধার করতে সক্ষম থাকে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি শেষে এই দাঁড়ায় যে, দাদার গৃহীত ঋণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পোতাদের ঘাড়ে চেপে বসে। এই মহাজনী কারবারে ইংল্যান্ডে সরকারীভাবে সূদের বাৎসরিক হার হল শতকরা ৪৮ ভাগ এবং বেসরকারী বাজারে ২৫০ থেকে ৪০০ ভাগ! আমেরিকায় সরকারীভাবে শতকরা ৩০ থেকে ৬০ ভাগ এবং বেসরকারী বাজারে ১০০ থেকে ২৬০ শতাংশ । অনেক সময় এ সূদের হার ৪৮০ শতাংশতেও পৌঁছে থাকে। আর আমাদের নিজের দেশ ভারতবর্ষেই বাৎসরিক ৭৫ শতাংশ হারে সূদ প্রচলিত যা অনেক সময় ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় ।

বরং বাৎসরিক ৩০০ থেকে ৩৫০ শতাংশ হারে সূদের দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে ।

প্রত্যেক দেশের গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরাট সংখ্যক লোক এই মহা আপদজালে মারাত্মকভাবে জড়িত। দিবারাত্রি বিরামহীন পরিশ্রমের পর যে সামান্য বেতন বা মজুরী তারা হাতে পায় তা থেকে সূদ আদায় করার পর তাদের নিকট দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে আহার করার মত পয়সাও অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে উক্ত পরিস্থিতি ঐ শ্রেণীর মানুষদের শুধুমাত্র চরিত্র নষ্ট ক'রে, অপরাধ-প্রবণতার দিকে ঠেলে দিয়ে, তাদের জীবন-যাপনের মান নিম্নমুখী ক'রে এবং তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার মান অনুন্নত করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং তার চূড়ান্ত পরিণাম এও যে, দুশ্চিন্তা ও কষ্ট-ক্লেশ দেশের সাধারণ কর্মশীল মানুষদের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাকে বহুলাংশে হ্রাস ক'রে দেয়। পরন্তু যখন তারা নিজেদের মেহনতের ফল অপরকে ভোগ করতে দেখে, তখন তাদের নিজেদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এই দিক থেকে সূদী কারবার কেবলমাত্র এক প্রকার যুলুমই নয়; বরং তা সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার পক্ষেও ভয়ানক ক্ষতিকর। যার সরাসরি প্রভাব পড়ে রুজী-রোজগার সম্পর্কিত উৎপাদনের উপর। আর ভাববার কথা এই যে, যদি পৃথিবীর ৫ কোটি

মানুষও মহাজনী সূদজালে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা গড়ে মাসিক ১০ টাকা হারে সূদ আদায় করতে থাকে, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, প্রতি মাসে ৫০ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় থেকে যাবে। আর এই বিপুল পরিমাণের অর্থ জীবন-জীবিকামূলক উৎপাদনের দিকে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে অতিরিক্ত সূদী ঋণ সৃষ্টির পশ্চাতে মাসের পর মাস ব্যয়িত হবে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মহাজনী ঋণ কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছিল। (এবারে সারা বিশ্ব জুড়ে এ ধরনের ঋণের পরিমাণ এবং এ ঋণ বাবদ মহাজনদের ঘরে আসা সূদের পরিমাণ কত তা অনুমেয়।)

২- বাণিজ্যিক ঋণ

যে ঋণ ব্যবসা, শিল্পোন্নয়ন এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাজ-কারবারে খাটাবার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় তার উপর সূদ গ্রহণ করাকে বৈধ প্রমাণ করার প্রেক্ষিতে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি পরিদৃষ্ট হয় তা একটু ঠাণ্ডা মাথায় পড়ুন।

পুঁজিপতিরা অংশীদার হিসাবে নিজেদের পুঁজি কোন ব্যবসায় খাটাবার পরিবর্তে ঋণদাতা হিসাবে ব্যবসায়ীদেরকে এ পুঁজি ঋণ-স্বরূপ প্রদান করে তা থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে নিজেদের সূদ আদায় করে থাকে। জীবিকা-সংক্রান্ত উৎপাদনকে উন্নত করার ব্যাপারে তাদের কোন প্রকারের আগ্রহ ও উদ্যম থাকে না। কারণ তারা তা করুক চাই না করুক সর্বাবস্থায় তাদের মুনাফা তো নির্দিষ্ট আছেই। কারো ব্যবসায় যদি নোকসান হয় তবুও তাদেরকে কোন চিন্তা স্পর্শই করে না। কারণ তাদের জন্য মুনাফা থাকে সুনিশ্চিত। ধরে নিন, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে এক ব্যক্তি ২০ বছরের মেয়াদে ৭ শতাংশ হারে একটি মোটা অংকের অর্থ ঋণ নিয়ে কোন একটি বড় ব্যবসা শুরু করল। এখন সে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নিয়মিতভাবে উক্ত হারে আসল টাকার কিস্তি সহ সূদ আদায় করতে বাধ্য। চুক্তি হয়েছিল ১৯৭০ সালে। কিন্তু ১৯৭৫ সাল পৌঁছতে পৌঁছতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়ে যদি আগের মূল্যের অর্ধেকে এসে ঠেকে, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, এই ব্যবসায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি শুরু হওয়ার সময়কালের তুলনায় বর্তমানে (১৯৭৫ সালে) দ্বিগুণ পণ্য বিক্রয় না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে না

তার সূদ আদায় করতে সক্ষম হবে, আর না আসল কিস্তি দিতে পারবে। এর অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, এ চড়ামূল্যের সময়কালে এ ধরনের অধিকাংশ ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যাবে, নতুবা দেউলিয়ার হাত থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা বিনষ্টকারী অবৈধ কোন কর্ম করে বসবে।

এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনি নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত হবেন যে, বিভিন্ন সময়কালে ওঠানামাকারী দ্রব্যমূল্যের মাঝে ঋণদাতা এ পুঁজিপতির সেই সকল মুনাফা যা সর্ব অবস্থা ও সময়ের জন্য এক সমান ও নির্দিষ্ট থাকে, তা অবশ্যই ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত নয় এবং অর্থনীতির দৃষ্টিকোণেও তা কোনক্রমেই যথার্থ বিবেচিত হবে না।

৩- রাষ্ট্রের বেসরকারী ঋণ

সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশের সরকার লাভজনক কাজ-কর্মে লাগানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু কোন সরকারই একটি নির্দিষ্ট হারে সূদের উপর ঋণ নেওয়ার সময় এ কথা জানতে পারে না যে, আগামী ২০/৩০ বছরের ভিতরে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বিশ্বের আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নেবে এবং সেই সঙ্গে যে কাজে ব্যয় করার জন্য সে এই সূদী ঋণ নিচ্ছে তাতে মুনাফা অর্জনের পরিমাণ ও অবস্থা কিরূপ থাকবে। অধিকাংশ সময়ে সরকারের অনুমান ভুল প্রমাণিত হতে দেখা যায়। সূদের হার অপেক্ষা বেশী হওয়া তো দূরের কথা সমপরিমাণ মুনাফা লাভও সম্ভবপর হয় না। এবারে পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, সরকার তার এ সূদের সাধারণ বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। ট্যাক্সের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির পকেট থেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঐ সূদের টাকা অসূল করে নেওয়া হয় এবং বছরের পর বছর লাখো লাখো টাকা জমিয়ে পুঁজিপতিদের নিকট দীর্ঘ সময়কাল যাবৎ পৌঁছানো হয়ে থাকে।

মনে করুন, আজ ৫ কোটি টাকার একটি সেচ-প্রকল্প কার্যকরী করা হল। আর এ কাজে ব্যয়িতব্য পুঁজি বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবারে এই হিসাবে সরকারকে প্রতি বছর ৩০ লাখ টাকা সূদ আদায় করতে হবে। বলা বাহুল্য, সরকার এত বড় অংকের টাকা

কোথাও মাঁটি খুড়ে বের করে আনবে না। বরং বোঝাটি সেই চাষীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে যারা ঐ সেচ-প্রকল্পের পানি থেকে লাভবান হবে। প্রত্যেক চাষীর উপর যে সেচকর আরোপ করা হবে, তাতে অবশ্যই ঐ সূদের অংশও থাকবে। আর চাষীরা নিজেরাও ঐ সূদ তাদের পকেট থেকে দেবে না; বরং তার সে অর্থ তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের দাম থেকে বের করে নেবে। এইভাবে উক্ত সূদ পরোক্ষভাবে প্রত্যেক সেই ব্যক্তির নিকট থেকে অসূল করা হবে, যে ঐ চাষীদের উৎপাদিত শস্য ব্যবহার করবে। আর অনুরূপভাবে প্রত্যেক গরীব ও দুঃখী ব্যক্তির রুটি থেকে এক টুকরা অথবা ভাতের বাসন থেকে এক মুঠো ভাত কেড়ে নিয়ে এ পুঁজিপতিদের বিরাট উদরে ঢেলে দেওয়া হবে; যারা বার্ষিক ৩০ লাখ টাকা সুদের ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে ঋণ দিয়েছিল। যদি সরকারকে এ ঋণ পরিশোধ করতে ৫০ বছর লেগে যায়, তাহলেও সে গরীবদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেই ধনীদেরকে পুষ্ট করার এ দায়িত্ব অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত নিয়মিত পালন করে যেতে থাকবে।

এমন কর্মপদ্ধতি সামাজিক অর্থ-ব্যবস্থায় ধনের প্রবাহকে ধনহীনদের নিকট থেকে সরিয়ে ধনবানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। অথচ সামাজিক কল্যাণ ও সফলতার উদ্দেশ্যে উচিত ছিল, ধন-মালের এ প্রবাহ ধনবানদের নিকট থেকে ধনহীনদের দিকে বহমান থাকা। এ অনিষ্টকারিতা কেবলমাত্র সেই সূদেই সীমাবদ্ধ নয় যা সরকার মুনাফাজনক ঋণের উপর আদায় করে থাকে বরং সেই সকল প্রকার সূদী লেনদেনেও তা নিহিত আছে, যা সাধারণতঃ বণিক-সমাজ করে থাকে। বলা বাহুল্য কোন ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা কৃষক পুঁজিপতিকে দেয় সূদ নিজের ঘর থেকে আদায় করে না। তারা সকলেই সেই বোঝা নিজেদের পণ্যের দামের উপর চাপিয়ে দেয় এবং এইভাবে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে এক পয়সা দু' পয়সা করে চাঁদা জমা করে লাখপতি পুঁজি-ওয়ালাদের ঝুলিতে ঢেলে দেওয়া হয়! এই উল্ট অর্থ-ব্যবস্থায় দেশের সব চাইতে বড় ধনাঢ্য মহাজনই সর্বাপেক্ষা অধিক 'সাহায্য লাভের অধিকারী' হয়। পরন্তু এ সাহায্যদানের দায়িত্ব যাদের উপর সব চাইতে বেশী বর্তায়, তারা হল সেই দরিদ্রশ্রেণীর দেশবাসী, যারা নিজেদের দেহের রক্ত পানি করে যৎসামান্য রোজগার করে আনে। উপরন্তু নিজেদের অভুক্ত সন্তানদের মুখে দু' মুঠো ডাল-ভাত

তুলে দেওয়াও তাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর পূর্বেই ঐ ডাল-ভাতের একটা অংশ দেশের সব চাইতে বেশী 'করুণার পাত্র' কোটিপতিদের জন্য বের করে দেয়।[৪৩]

সরকারের বৈদেশিক ঋণ

এবারে দেখুন, সরকার দেশের বাইরের বিদেশী মহাজনদের নিকট থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাতে অর্থনৈতিক কি ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে; এ ধরনের ঋণ সাধারণতঃ ১০/২০ কোটির মাত্রা অতিক্রম করে ১০০ থেকে ১০০০০ কোটির পর্যায়ে পৌঁছে থাকে। এ ধরনের ঋণ সরকার সাধারণতঃ তখন গ্রহণ করে থাকে যখন দেশে কোন অস্বাভাবিক সংকটাবর্ত ও দুরবস্থা আপতিত হয় এবং দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ সে বিপদ থেকে নিস্কৃতি লাভে যথেষ্ট প্রমাণিত হয় না। আবার কখনো এ লোভে পড়েও ঋণ গ্রহণ করে থাকে যে, বড় অংকের পুঁজি নিয়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ করলে দেশের উপায়-উপকরণ স্বল্প সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। এই শ্রেণীর ঋণে সূদের হার সাধারণতঃ ৬/৭ শতাংশ থেকে ৯/১০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর সূদের উক্ত হার অনুযায়ী কয়েক শত কোটি টাকার বার্ষিক সূদ কয়েক কোটি টাকা হয়। অপর দিকে ঋণদাতা দেশ যমানত স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা দেশের কোন একটা শুল্ক; যেমন চিনি লবণ অথবা অন্য কোন খাতের আয়কে বন্ধক রেখে নেয়।

ইতিপূর্বে সূদের যে সমস্ত অনিষ্টকারিতা আমরা আলোচনা করেছি তার সবটাই নিহিত রয়েছে এই ধরনের সূদী ঋণে। উপরন্তু ঋণের এই শ্রেণীতে এ সকল ক্ষতি ছাড়াও আরো এক প্রকার ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যা পূর্বালোচিত ক্ষতিসমূহের মধ্যে সব চাইতে বেশী ভয়াবহ। আর তা হল এই যে, এ ধরনের বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে পুরাপুরিভাবে জাতির আর্থিক অবস্থা ধ্বংস এবং অর্থনৈতিক মান সর্বনাশগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর এর নিতান্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর।

[43] (দেখুন, সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ৬৮ পৃঃ)

অধিকন্তু এরই মাধ্যমে জাতির মানুষের হৃদয়ে-হৃদয়ে রোপিত হয় শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ ।

পরিশেষে এরই কারণে বিপদাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জাতির তরুণদল বিক্ষুব্ধ ও অতিষ্ঠ হয়ে চরমপন্থী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দর্শন গ্রহণ করতে শুরু করে। অতঃপর এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অথবা সর্বনাশী সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের জাতির দুর্দশা ও সংকট নিরসনের উপায় অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে দেয়।

নিজের সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে যে জাতিই কোন বড় অংকের অর্থ সূদী ঋণ গ্রহণ করে, তাকে খুব কমভাগই সেই সমস্যা অপসারণে সফলকাম হতে দেখা যায়---যার কারণে সে ঋণ গ্রহণ করে। বিপরীত পক্ষে এই ঋণই সে জাতির সংকট ও সমস্যার বৃদ্ধিতে সহায়কশক্তি হিসাবে কাজ করে। ঋণের কিস্তি ও সূদ আদায় করার জন্য তার নিজের দেশবাসীর উপর খুব বেশী ট্যাক্স ও করভার চাপিয়ে দিতে হয় এবং অনেক দিক থেকেই ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী হ্রাস করতে হয়। এর ফলে এক দিকে যেমন জাতির সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায় তেমনি অপর দিকে নিজের দেশবাসী জনগণের উপর এত পরিমাণে ভারী বোঝা চাপিয়েও সরকারের পক্ষে ঋণের কিস্তি এবং সূদ নিয়মিতভাবে আদায় করে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা দেশের পক্ষ থেকে যখন ঋণ আদায়ে অনবরত শৈথিল্য দেখা দেয়, তখন বৈদেশিক ঋণদাতা দেশ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ও অপবাদ লাগিয়ে বলতে থাকে, 'বেঈমান দেশ, আমাদের ঋণের টাকা ফাঁকি দিতে চায়' ইত্যাদি। তাদের ইশারা মতে তাদের জাতীয় সংবাদপত্র এবং আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো এই দরিদ্র দেশের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে লাগে।

ঋণগ্রহীতা দেশ এই ফাঁদ থেকে সত্বর বের হতে চেষ্টা করে। এতদুদ্দেশ্যে সে দেশবাসীর উপর করভার আরো বৃদ্ধি করে এবং অধিকতর ব্যয় সঙ্কোচন করে কোন প্রকারে দ্রুত নিস্কৃতি লাভের চেষ্টা করে। শেষে দেশের জনগণ দেশ ও তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।[৪৪]

[44] (সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং দ্রষ্টব্য)

সূদের এ সকল ধ্বংসকারিতা ও সর্বনাশিতা ছাড়াও কিছু ঋণগ্রহীতা দেশের অবস্থা একবার ঠাণ্ডা মাথায় পড়ুন ঃ-

১৯৮১ সালে ২৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণগ্রস্ত দেশ পোলান্ড ঘোষণা করেছে যে, ঋণদাতাদেরকে পরিশোধ করার মত আড়াই বিলিয়ন ডলার তার নিকট নেই। এ বছরেই আগষ্ট মাসে মেক্সিকো ঘোষণা করেছে যে, সে বৈদেশিক ঋণের সূদ ৮০ বিলিয়ন ডলার আদায় করতে অক্ষম। এরপর ব্রাজিল ঘোষণা করেছে যে, সে তার ৮৭ বিলিয়ন চাইতেও বেশী ডলারের ঋণ আদায় করতে অসমর্থ।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (INTERNATIONAL MONETARY FUND) এ কথা ঘোষণা করেছে যে, ৩২ টি দেশ এমন রয়েছে যে, ১৯৮১ সাল থেকে তারা তাদের ঋণ পরিশোধে অক্ষম।

এবারে কতিপয় দেশের গৃহীত ঋণের সংক্ষিপ্ত হিসাব লক্ষ্য করুন ঃ

১৯৮৩ সালের ঋণরাশির আনুমানিক তালিকা (বিলিয়ন ডলারে)

দেশের নাম	১৯৮২র শেষ পর্যন্ত সর্বমোট ঋণ	১৯৮৩ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ	রপ্তানীর তুলনায় আদায়কৃত অর্থের হার
ব্রাজিল	৮৭	৩০.৮	১১৭%
মেক্সিকো	৮০.১	৪৩.১	১২৬%
আর্জেন্টিনা	৩৪.১	১৮.৪	১৫৩%
উত্তর কোরিয়া	৩৬	১৫.৭	৪৯%
ভেনিজুয়েলা	২৮	১৯.৯	১০০%
পোল্যান্ড	২৬	৭.৮	৯৪%
রাশিয়া	২৩	১২.২	২৫%
মিসর	১৯.২	৬	৪৬%
যুগোস্লাভিয়া	১৯	৬	৪১%
ফিলিপাইন	১৬.৬	৭	৭৯%
পশ্চিম জার্মানী	১৪	৬.৩	৮৩%
পেরো	১১.৫	৩.৯	৭৯%
রোমানিয়া	৯.৯	৫.৫	৬১%
নাইজেরিয়া	৯.৩	৪.৯	২৮%
হাঙ্গেরী	৭	৩.৫	৫৫%

যাইর	৫.১	১.২	৮৩%
নামিবিয়া	৪.৫	২	১৯৫%
বলিভিয়া	৩.১	১	১১৮%

(দেখুন, আর রিবা, ডক্টর উমার আশকার ১৪৮-১৫২ পৃঃ)

আল্লাহ তাআলা কি সত্যই না বলেছেন,

﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং সাদকাহকে বৃদ্ধি দান করেন।[৪৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

অর্থাৎ, আমি ওদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিকচক্রবালে প্রদর্শন করব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য।[৪৬]

প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل.

অর্থাৎ, "সূদ পরিমাণে যতই বেশী হোক না কেন পরিণামে তা কম হতে বাধ্য।"[৪৭]

প্রিয় পাঠক! সূদের এমন মারাত্মক পরিণতি ও ফলাফল দর্শন করার পরেও কি কোন জ্ঞানসম্পন্ন ও বিবেকবান মানুষ এ কথা মেনে নিতে দ্বিধা করতে পারে যে, সূদ এমন এক ক্ষতিকর নিকৃষ্ট জিনিস, যা চূড়ান্তভাবে হারাম হওয়া অবশ্যই উচিত? সূদের এ অপকারিতা ও ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করার পরও কি নবী ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করতে পারে?

[45] (সূরা বাক্বারাহ ২৭৬ আয়াত)
[46] (সূরা ফুসসিলাত ৫৩ আয়াত)
[47] (মুসনাদে আহমদ ১/৩৯৫, ৪২৪, ইবনে মাজাহ ২২৭৯, বাইহাকী, মিশকাত ২৮২৭ নং)

الربا سبعون جزءا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه.

অর্থাৎ, "সূদ এমন একটি বড় গোনাহ যে, যদি তাকে সত্তর ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে তার সবচেয়ে হালকা অংশটিও নিজের মায়ের সহিত ব্যভিচার করার সমান গোনাহর শামিল!"[৪৮]

প্রিয় পাঠক! সূদের উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা পাঠের পর আশা করি আপনার এ অনুমান ও ধারণা হয়েছে যে, সূদ ইসলামের দৃষ্টিতে কত বিরাট অপরাধ ও পাপ এবং সূদের মধ্যে কি কি অনিষ্টকারিতা ও সর্বনাশিতা নিহিত রয়েছে। এবারে পরবর্তী আলোচনায় উক্ত সূদ বর্তমান যুগে কোন্ শ্রেণীর ব্যবসা ও কারবারে পাওয়া যায়, তা আমরা অবগত করাতে চাই। তাই আসুন, প্রথমত আমরা প্রচলিত বিভিন্ন কারবার প্রসঙ্গে পুরাপুরি জ্ঞানলাভ করে নিই। তাহলেই কোন্ ধরনের কারবারে সূদ আছে এবং কোন্ ধরনের কারবারে সূদ নেই তা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর একজন তওহীদবাদী এবং পূর্ণ ঈমান ও দ্বীনদার মুসলিমকে কোন্ কোন্ ধরনের কারবার করা এবং কোন্ ধরনের কারবার থেকে দূরে থাকা উচিত---তাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কারবারে বিভিন্ন প্রকারভেদ

(DIFFERENT KINDS OF BUSINESS)

মালিকানার দিক থেকে কারবার তিন প্রকারের ঃ-

১- ব্যক্তিগত (PRIVATE PROPRIETORSHIP) কারবার।

২- অংশীদারী (PARTNERSHIP) কারবার।

৩- যৌথ (JOINT STOCK COMPANY) কারবার।

প্রথমোক্ত দুই প্রকারের কারবার ও ব্যবসা মানুষ যখন থেকে কারবার করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই প্রচলিত। ইসলামী ফিক্হবিদগণ উভয়ের মৌলিক ও সবিস্তার বিবরণ এবং বিভিন্ন রীতি-নিয়ম (ফিক্হ গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেণীর কারবারের বর্তমান পরিস্থিতি অতীতের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্নতর নয়। আর এ জন্যই এখানে আমরা

[48] (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, মিশকাত ২৮২৬ নং, সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ১৮৫৭)

তার বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাচ্ছি না। সুতরাং এ স্থলে কেবল অংশীদারী কারবারের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ করব। অবশ্য কোম্পানী বা যৌথ কারবার ব্যবসায়ের এক নতুন শ্রেণী, যার অস্তিত্ব ফিকহ্‌বিদ্‌গণের যুগে বর্তমান ছিল না। তাই এই ধরনের কারবারের বিস্তারিত বিবরণ অধিকরূপে দিতে চেষ্টা করব।

অংশীদারী কারবারের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ

ইসলামী ফিক্‌হবিদ্‌গণ এই কারবারের নিম্নোক্ত প্রকারসমূহ বর্ণনা করেছেনঃ-

১- 'শারিকাতুল মুফাওয়াযাহ' (THE PARTNERSHIP OF NEGOTIATION) **আপোষচুক্তিমূলক অংশীদারী ঃ-**

ফকীহবৃন্দের পরিভাষায় শারিকাতুল মুফায়াওযাহ এই যে, দুই (বা ততোধিক ব্যক্তি) কোন কারবার করার উপর এই শর্তের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, উভয়ে এ কারবারে অংশীদার হয়ে নিজ নিজ মাল বা অর্থ বিনিয়োগ করবে। কারবারের ব্যাপারে এক অপরের তরফ থেকে সব রকমের লেনদেনে উভয়েই অনুমতিপ্রাপ্ত থাকবে, উভয়েই লাভের ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী শরীক হবে এবং নোকসানের ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাল বা অর্থের পরিমাণ ও হার অনুপাতে সকলে ভাগী হবে। উল্লেখ্য যে, এর শর্তাবলী বড় সূক্ষ্ম।

২- 'শারিকাতুল আনান' (THE EQUAL SHARES IN THE PARTNERSHIP) **বা সমঅংশের অংশীদারী ঃ-**

এই কারবারে দুটি লোক নিজ নিজ মাল বা অর্থ সহ এই শর্তে শরীক হয় যে, উভয়ে এ মালে ব্যবসা করবে এবং নিজ নিজ মালের পরিমাণ ও হার অনুপাতে উভয়েই লাভ ও নোকসানে শরীক হবে।

এই কারবার ও 'শারিকাতুল মুফাওয়াযাহ' এর মাঝে পার্থক্য হল এই যে, 'মুফাওযাহ'তে উভয় অংশীদার সর্বাবস্থায় এক অপরের প্রতিনিধি ও প্রতিভূ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে 'আনান' এ উভয়ের মধ্যে কেউই মালের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করতে পারে না। অবশ্য চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সীমিত বিষয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে।

৩- শারিকাতুল আ'মাল বা আবদান (THE PARTNERSHIP OF THE BODIES) **বা দৈহিক অংশীদারী ঃ-**

এই কারবারে দুই অথবা ততোধিক কারিগর ব্যক্তি কোন বিশেষ কাজ এক সঙ্গে করতে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কাজের মজুরী চুক্তি অনুসারে উভয়ের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা হবে।

এতে এক বা বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন লোক হতে পারে। যেমন ছুতোর ও দর্জির এই কারবারে এক অপরের শরীক হিসাবে একত্রে কাজ করা বৈধ।

৪- 'শারিকাতুল উজুহ' (THE PARTNERSHIP OF THE ESTEEM) **বা প্রতিপত্তিমূলক অংশীদারী ঃ-**

এই কারবারে দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তি নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে ধারে কোন পণ্য ক্রয় করার চুক্তি করে সেই ক্রীত পণ্য নিয়ে সকলে ব্যবসা করে। অতঃপর পণ্যের মালিককে মূল্য পরিশোধ করে যে লাভ অবশিষ্ট থাকে, তা আপোসে ভাগাভাগি করে নেয়। আর নোকসানের ক্ষেত্রেও সকলেই সমান ভাগী থাকে।

৫- 'শারিকাতুল মুযারাবাহ' (THE SPECULOTION) **বা ঝুঁকিবিশিষ্ট অংশীদারী ঃ-**

এই কারবারে এক ব্যক্তি নিজের মাল অপর ব্যক্তিকে ব্যবসা করার জন্য প্রদান করে এবং চুক্তি অনুপাতে উভয়েই লাভের ভাগী হয়। কিন্তু নোকসান হলে তা শুধু মাল-ওয়ালাই বহন করে এবং যে ব্যবসা করে, সে নোকসানের ভাগী হয় না। কারণ, তার পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়াটাই নোকসানের ভাগী হওয়া।

প্রিয় পাঠক! উপরোল্লেখিত সকল শ্রেণীর ব্যবসা ও কারবারকে শরীয়ত বৈধ চিহ্নিত করেছে এবং এর মধ্যে কোন প্রকার কারবারকেই হারাম ও অবৈধ গণ্য করেনি। পক্ষান্তরে যদি কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি এই ধরনের কোন অংশীদারী কারবার করতে চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহলে শরীয়ত তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। কারণ উক্ত প্রকার কারবারগুলোর মধ্যে কোন কারবারেই সূদ বা সূদের গন্ধও নেই।

আসুন এবারে আমরা তৃতীয় প্রকার কারবার 'কোম্পানী' প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করি।

কোম্পানীর পরিচিতি

কোম্পানীর আভিধানিক অর্থ হল সংঘ। অবশ্য কখনো কখনো 'সঙ্গী'র অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে শিল্পিক বিপ্লব বিকাশ হওয়ার পরে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে যখন বিরাট অংকের পুঁজির প্রয়োজন দেখা দিল; পরন্তু ঐ পরিমাণ পুঁজি কোন এক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা জমা বা যোগাড় করা সম্ভবপর ছিল না, তখন সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকেদের সঞ্চিত অর্থ একত্রীভূত করে যৌথভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে কোম্পানী-ব্যবস্থা চালু হল। এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে কয়েক ব্যক্তির একটি দলকে একটিমাত্র আইনসম্মত ব্যক্তির পজিশন দেওয়া হয়। ঐ আইনসম্মত ব্যক্তিকে 'কর্পোরেশন' বলা হয়। যার একটি বিভাগ কোম্পানী নামে পরিচিত।

কোম্পানীর গঠন-পদ্ধতি

সর্ব প্রথমে অভিজ্ঞ ও সুকৌশলী ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। যে কারবার শুরু করা হবে তার কার্যক্ষমতা ও পরিধি কতদূর? এর জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও পুঁজি কত পরিমাণ প্রয়োজন হতে পারে? এবং বাণিজ্যিক্ দিক থেকে কারবার কতটুকু উপকারী হবে--- এসব কিছু উক্ত রিপোর্টে স্থির করা হয়। একে সম্পাদন-যোগ্যতার প্রতিবেদন (FEASIBILITY REPORT) বলে।

অতঃপর কোম্পানীর একটা সংক্ষিপ্ত কাঠামো তৈরী করা হয়। যাতে কোম্পানীর নাম, কারবারের রকমত্ব, প্রয়োজনীয় পুঁজি, পরিচালকবৃন্দের নাম, আগামীতে তাদের পদচ্যুত ও পদস্থ করার নিয়ম-নীতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। একে বলা হয় স্মারকলিপি (MEMORANDUM)। অতঃপর কোম্পানী পরিচালনার নিয়মাবলী লিখা হয়; যাকে (ARTICLE OF ASSOCIATION) বলে। কোম্পানী অনুমোদনের জন্য মেমোরান্ডাম এবং আর্টিক্যাল অফ্ অ্যাসোশিয়েশন সহ সরকারের নিকট দরখাস্ত পেশ করা হয়। অতঃপর অর্থমন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন বিভাগ (CORPORATE LOW AUTHORITY) এর তরফ থেকে অনুমোদন পাওয়া গেলে 'কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবারে আইন তাকে 'বিকল্প ব্যক্তি' রূপে স্বীকৃতি দেয়;

যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, মামলা-মোকাদ্দামায় বাদী-প্রতিবাদী হবে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে ঋণদাতা ও ঋণগ্রস্তও হতে পারবে। যাকে আইনসম্মত ব্যক্তি (LEGAL PERSON) অথবা (JURIDICAL PERSON) বলা হয়।

কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করলে লোকদেরকে তাতে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে এবারে তার সম্পূর্ণ নিয়ম-নীতি ও সাংগঠনিক কাঠামোর প্রচার করা আইনগতভাবে জরুরী হয়; যাতে জনসাধারণের নিকট এ কোম্পানী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিতি লাভ করে।

কোম্পানীর মৌলিক নিয়ম-নীতি এবং তার আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে জনসাধারণের অবগতির জন্য যে লিখিত বিবরণী প্রচার করা হয়, তাকে (PROSPECTUS) বলা হয়।

সরকার যখন কোম্পানীকে অনুমোদন প্রদান করে, তখন তার পুঁজি ও মূলধনের ব্যাপারটাও নির্দিষ্ট করে দেয়। এত টাকার পুঁজির অংশীদারী কার্যকর করা যেতে পারে বা এত টাকার পুঁজিতে শরীক হতে জন সাধারণকে আহ্বান করা যেতে পারে বলে টাকার অংশ সীমিত করে দেয়। একে বলা হয় 'অনুমোদিত মূলধন' AUTHORISED CAPITAL)। উদাহরণ স্বরূপ, ১০০ মিলিয়ন টাকা নিয়ে কারবার করতে কোম্পানী অনুমতি পেল। সুতরাং এ ১০০ মিলিয়ন টাকাই হল 'অনুমোদিত মূলধন'। এর মধ্যে ২০ মিলিয়ন টাকা কোম্পানী প্রতিষ্ঠাতাদের দায়িত্বে থাকে; যাকে (SPONSORS CAPITAL) বলে। আর ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। যার মধ্য হতে ৬০ মিলিয়ন টাকার অংশীদারী আপাতত জারী করা হয় এবং বাকী টাকা আগামীতে কোন প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। উক্ত ৬০ মিলিয়ন টাকাকে প্রচলিত মূলধন (ISSUED CAPITAL) বলা হয়। আবার ৬০ মিলিয়ন টাকার মধ্য হতে লোকেরা যে ৫০ মিলিয়ন টাকার জন্য ফর্ম জমা করে, তাকে (SUBSCRIBED CAPITAL) বলে। যখন লোকেরা নিজেদের পুঁজি জমা করে কোম্পানীর এক-একটা অংশ গ্রহণ করে, তখন কোম্পানী প্রত্যেক অংশীদারকে একটি করে সার্টিফিকেট প্রদান করে। আর এই সার্টিফিকেট এ কথার দলীল যে, কোম্পানীতে তার এত অংশ আছে। একে বলা হয় শেয়ার (SHARE)। কারবার যত টাকার মূলধন দ্বারা আরম্ভ করা হয়, তাকে

ঐকিক নিয়মে ভাগ করে একভাগকে শেয়ারের মূল্য স্থির করা হয়। যেমন, আজকাল সাধারণতঃ দশ দশ টাকার শেয়ার জারী করা হয়ে থাকে। এই মূল্য শেয়ারের উপর লিখিত হয়। আর এই মূল্যকে FACE VALUE বলা হয়। উক্ত শেয়ার কিনতে ও বেচতে পারা যায়। এর জন্য সংভার বিনিময়কেন্দ্র (STOCK EXCHANGE) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

লভ্যাংশ বিভাজন ও বন্টন

সারা বছর ধরে কারবার চালাবার পর কোম্পানী বার্ষিক লাভের হিসাব খতিয়ে দেখে। সর্বমোট লাভ কত দাঁড়ালো তা নিরূপণ করে নেয়। অতঃপর মোট লাভ থেকে কিছু অংশ সাবধানতা-পূর্বক সংরক্ষিত রাখা হয়; যাতে আগামীতে কোম্পানী কোন ক্ষতি বা নোকসানের শিকার হলে তা থেকে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়। একে বলা হয় (RESERVE) সংরক্ষণ।

সাবধানতাপূর্বক এ অর্থ বের করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা শেয়ার হোল্ডার্সদের মাঝে ভাগ-বন্টন করা হয়।

এই বিভাজনের হয় দুটি পদ্ধতি; কখনো কখনো নগদ লাভ শেয়ারওয়ালাদেরকে প্রদান করা হয়। আবার কখনো বা এ লভ্যাংশ দ্বারা পুনঃ শেয়ার জারী করা হয়; যাকে BONUS SHARE বলা হয়।

প্রিয় পাঠক! এ হল কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত চিত্র। যেহেতু ব্যাংক মৌলিকভাবে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীরই দ্বিতীয় নাম সেহেতু কোম্পানীর উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা আমাদের জন্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাংক কেবলমাত্র টাকা লেন-দেনের কারবার করে থাকে। শিল্প কারিগরী, কৃষি উৎপাদন, নির্মাণ-প্রকল্প এবং অন্যান্য উপকারী মুনাফাজনক কাজ ও কারবারে ওর কোন আগ্রহ নেই। ও তো কেবল শিল্পী, কারিগর, কৃষক এবং কোম্পানীকে সূদের ভিত্তিতে পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। পক্ষান্তরে কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের শিল্প, কৃষি, নির্মাণ-প্রকল্প এবং আরো অন্যান্য লাভজনক কার্য সরাসরি বাস্তবায়ন করে থাকে।

আসুন, এবার আমরা ব্যাংক সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করি। কারণ এ বিষয়েও আপনার অবগতি একান্ত জরুরী।

ব্যাংকের পরিচিতি

BANK শব্দটি ইটালী ভাষার BANCO শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হল DESK (ডেস্ক্) অথবা TABLE (টেবিল)। যেহেতু সে যুগের লোকেরা টাকাপয়সার অনুরূপ কারবারকারীরা ডেস্ক্ অথবা টেবিল নিয়ে বসত, তাই তার নাম BANK বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

ব্যাংক এমন এক বাণিজিক-প্রতিষ্ঠানের নাম; যে জনসাধারণের অর্থ নিজের কাছে জমা ও সঞ্চয় করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং অন্যান্য অভাবী ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনে ঋণ সরবরাহ করে থাকে। বর্তমানে গতানুগতিক ব্যাংকগুলো ঐ ঋণের উপর সূদ আদায় করে এবং টাকা জমাকর্তা জনসাধারণকে তুলনামূলক কম হারে সূদ প্রদান করে থাকে। মাঝখানে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা হল ব্যাংকের লাভ।

ব্যাংকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

পাশ্চাত্য দেশে ব্যাংকের সূচনা এইভাবে হল যে, লোকেরা নিজ নিজ সোনা স্বর্ণকারদের নিকট জমা করে রাখত। (কারণ সে যুগে নোটের প্রচলন ছিল না।) স্বর্ণকাররা এ স্বর্ণের সমপরিমাণ অর্থের রসিদ লিখে দিত। রসিদে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকত যে, রসিদবাহকের এত পরিমাণ সোনা অমুক স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রয়েছে। অতঃপর ধীরে ধীরে রসিদসমূহ ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ পরিশোধ ও আপোসে দেনা-পাওনার কাজে একজন হতে অন্য জনের নিকট স্থানান্তরিত হতে লাগল, কারণ রসিদ দেখিয়ে স্বর্ণকারের নিকট থেকে সোনা উঠিয়ে তার মাধ্যমে লেন-দেন করার চাইতে এ রসিদই এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (পণ্যের বিনিময়ে) প্রদান করাটা অধিকতর সহজ ছিল। আর একজনকে এ রসিদ সোপর্দ করার অর্থ এক রকম সোনা সোপর্দ করাই ছিল।

এইভাবে লোকে আসল সোনা ফেরত নিতে কমই আসত। এবারে অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বর্ণকাররা জানতে পারল যে, লোকেদের যে সোনা তাদের নিকট গচ্ছিত আছে তার বড়জোর দশ ভাগের এক ভাগ মালিকেরা বের করে নিয়ে যায় এবং বাকী নয় ভাগ তাদের অর্থ-ভান্ডারে অযথা পড়েই থাকে। সুতরাং তারা এ সোনা ঋণপ্রার্থী লোকদেরকে ঋণ স্বরূপ দিয়ে তার

উপর সূদ আদায় করা শুরু করল। পরন্তু যখন তারা দেখল যে, লোকেরা অধিকাংশ কাগজের রসিদ বিনিময়ের মাধ্যমেই তাদের ব্যবসায় লেন-দেন করছে এবং নিজেদের সোনা ফেরৎ নিতে আসে না, তখন এ আসল সোনা ঋণস্বরূপ দেওয়ার পরিবর্তে তারই সমমূল্যরূপে কাগজী রসিদ বাজারে চালাতে লাগল। আর যেহেতু অভিজ্ঞতায় তারা জানতে পেরেছিল যে, গচ্ছিত স্বর্ণসম্ভার হতে কেবল এক দশমাংশই মালিকেরা তাদের স্বর্ণ ফেরৎ চায়; সেহেতু তারা বাকী নয় ভাগের সমমূল্যের---নয় ভাগের নয় বরং---নব্বই ভাগের জাল রসিদ তৈরী করে পত্রমুদ্রা (নোট) হিসাবে বাজারে চালাতে এবং ঋণ দিতে আরম্ভ করল।

এ ব্যাপারটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এভাবে বুঝুন; মনে করুন, এক ব্যক্তি স্বর্ণকারের নিকট ১০০ টাকা মূল্যের সোনা জমা রেখেছিল। স্বর্ণকার এক-একশ' টাকার দশটি রসিদ তৈরী করল এবং তার প্রত্যেকটিতে এই কথা লিখে দিল যে, 'এই রসিদের স্থলে ১০০ টাকার সোনা আমার নিকট গচ্ছিত আছে।' উক্ত দশটি রসিদের মধ্যে একটি মাত্র সোনার মালিককে সোপর্দ করল এবং নয় শত টাকার নয়টি রসিদ অন্য লোকেদেরকে ঋণ দিয়ে তার উপর সূদ আদায় করতে শুরু করে দিল।

এরপর তারা আরো এক পা অগ্রসর হল। আর তা এই যে, যে যুগে এই আধুনিক মহাজনরা উক্ত জাল পুঁজির সাহায্যে প্রচুর অর্থশক্তি সঞ্চয় করে মাথা তুলে উঠছিল সেই যুগেই পশ্চিম ইউরোপে একদিকে শিল্প ও বাণিজ্য বন্যার বেগে বেড়ে চলেছিল এবং অপর দিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি নতুন ইমারত গড়ে উঠছিল---যা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত জন-জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন গঠন চাচ্ছিল। এসব কাজের জন্য দরকার ছিল পুঁজির। অপর দিকে সোনার মালিকরাও নিজের মূলধন নিয়ে বিভিন্ন কারবার শুরু করতে লাগল। এবারে স্বর্ণকার মহাজনরা যখন দেখল যে, লোকেরা তাদের নিজেদের পুঁজি ব্যবসায় খাটাতে শুরু করেছে, তখন তারা প্রমাদ গণল। তারা এ স্বর্ণমালিকদেরকে বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'আপনারা এত সব ঝামেলা কেন পোহান? এভাবে নিজে নিজে ব্যবসা করলে তো নিজেকেই হিসাব-নিকাশ রাখতে হবে। এছাড়া নোকসানের পাল্লায়ও তো পড়তে পারেন। তাছাড়া মুনাফার বৃদ্ধি-হ্রাস আপনার আয় আমদানীর উপর প্রভাব ফেলবে। অতএব এসব করার

পরিবর্তে আপনি আপনার অর্থ আমাদের নিকট জমা করুন। আমরা আপনার সে অর্থের রক্ষণাবেক্ষণও করব, তার হিসাব-নিকাশও বিনা পয়সায় রাখব, আর আপনার নিকট কিছু নেওয়ার পরিবর্তে উল্টে আপনাকেই তার সূদ আদায় করতে থাকব।' এই নতুন কৌশলের ফলেই সঞ্চিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ বরং এর চাইতেও বেশী অর্থ সরাসরি রুজি-রোজগার ও সংস্কৃতির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে সূদখোর মহাজনদের ভোগে চলে গেল এবং এইভাবে প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায় বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি তাদের হস্তগত হল। অবশেষে পরিস্থিতি এই দাঁড়াল যে, মহাজনরা তো পূর্ব থেকেই তাদের ভুয়ো পুঁজি সূদী কারবারে খাটিয়ে আসছিল, এখন অন্যদের পুঁজিও তারা সস্তা হার সূদে নিয়ে চড়া হার সূদে ঋণ দিতে লাগল।

অতঃপর এ দলটি তৃতীয় পদক্ষেপ উঠালো। তারা চিন্তা করল ব্যবসায়ের বিভিন্ন শাখায় যেমন যৌথ পুঁজির কোম্পানী গঠিত হচ্ছে ঠিক অনুরূপভাবে অর্থ-ব্যবসার ক্ষেত্রেও কোম্পানী গঠন করতে হবে এবং এর জন্য উচ্চমানের সংগঠন কায়েম করতে হবে। সুতরাং তাই করা হল এবং এইভাবেই আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার উৎপত্তি হল। যে ব্যাংক আজ সারা দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে।

এইভাবে দুনিয়ার প্রথম ব্যাংক ১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর এক শহর ভেনিস (VENICE)এ প্রতিষ্ঠালাভ করে; যার নাম ছিল BANACODELLA PIZZADI RIAALRO। অতঃপর এরপরে ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে বারশিলোনা শহরে আমানত রাখা যায় এমন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়। আর এর পর থেকেই ব্যাংকের পরম্পরা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে।[৪৯]

অর্থসংস্থানের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাংকের প্রকারভেদ ঃ

বর্তমান বিশ্বে কয়েক প্রকারেরই ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্যাংক বিশেষ বিশেষ বিভাগে অর্থসংস্থানের কাজ করে থাকে। আর অপর কিছু ব্যাংক সাধারণভাবে অর্থসংস্থানের কাজ করে। এভাবে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত প্রকারে বিভক্ত ঃ-

[49] (মাওয়াক্বিফুশ শারীআতি মিনাল মাসারিফিল মুআসিরাহ ২২-২৩পৃঃ)

১- কৃষি উন্নয়নমূলক ব্যাংক (AGRICULTURAL BANK)। এ ব্যাংক কৃষিকার্যের সকল ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

২- শিল্পোন্নয়নমূলক ব্যাংক (INDUSTRIAL BANK)। এর কাজ হল বিভিন্ন শিল্পকর্মের উন্নতিকল্পে ঋণ সরবরাহ করা।

৩- প্রগতিমূলক ব্যাংক (DEVELOMENT BANK)। এ ব্যাংক যে কোনও প্রগতি ও উন্নয়মূলক কাজে ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

৪- সমবায় ব্যাংক (CO-OPERATIVE BANK)। এই ব্যাংক পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়। এর কর্মপরিধি কেবল সদস্যদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। যারা এর সদস্য হয় কেবল তাদেরই অর্থ ডিপোজিট থাকে এবং তাদেরকেই ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫- বিনিয়োগমূলক ব্যাংক (INVESTMENT BANK)। এ ব্যাংকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ডিপোজিট রাখা হয়। সাধারণ কারেন্ট একাউন্ট বা সেভিং একাউন্ট এতে থাকে না; কেবলমাত্র ফিক্সড্ ডিপোজিট থাকে। আর ঋণও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়। এর চাইতে কম মেয়াদের জন্য ঋণ দেওয়া হয় না।

উপরোল্লেখিত সকল প্রকার ব্যাংকের কর্ম-পরিধি সীমাবদ্ধ হয়।

৬- বাণিজ্যিক ব্যাংক (COMMERCIAL BANK) । এ ব্যাংক সাধারণ অর্থসংস্থানের কাজ করে থাকে এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্র ও বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় না।

৭- রিজার্ভ ব্যাংক (RESERVE BANK)। এটি দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; সকল প্রকার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এরই তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় এর বড় ভূমিকা থাকে। এই ব্যাংকের বিভিন্ন ফাংশন নিম্নরূপ ঃ-

ক- এটি হল সরকারী ব্যংক। সরকারের অর্থ এতে জমা রাখা হয়। তবে এ অর্থের উপর সরকারকে সূদ দেওয়া হয় না। প্রয়োজনের সময় সরকারকে ঋণও দিতে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাংক মামূলী হারে সূদ গ্রহণ করে থাকে।

খ- রিজার্ভ ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক পলিসীতে উপদেষ্টার কাজও করে।

গ- রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় মুদ্রা গচ্ছিত রাখে, পুঞ্জীভূত করে এবং প্রয়োজন মত তা জারীও করে।

ঘ- রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান ভূমিকা হল দুটি; প্রথমতঃ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের এ তত্ত্বাবধান করে এবং উক্ত ব্যাংকগুলোর নিয়ম-শৃঙ্খলা বহাল রাখে; যাতে করে সেগুলো থেকে আর্থিক মুনাফা অর্জন হয় আর লোকসানের সকল দরজা বন্ধ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, এই ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যাতে সেই স্ফীতি হ্রাস পেতে শুরু করে দেয়। আবার মুদ্রার মান অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতেও এমন উপায় অবলম্বন করে যাতে তা কমতে বাধ্য হয়।

এই মুদ্রার মান হ্রাস বৃদ্ধির কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে ঃ-

ক- রিজার্ভ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে যে হারে সূদের উপর ঋণ প্রদান করে, সে হারকে 'ব্যাংক রেট' বলে। ব্যাংক রেটও মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে প্রভাবশীল হয়। আর তা এইভাবে হয় যে, যখন রিজার্ভ ব্যাংক সূদের হার বেশী করবে, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও অতিরিক্ত সূদের ভিত্তিতে ঋণ নেবে। সে জন্য এ ব্যাংকগুলোও ঋণগ্রহীতা জনসাধারণকে অতিরিক্ত সূদের উপরই ঋণ দেবে। যার পরিণাম এই দাঁড়াবে যে, জনসাধারণ ঋণ কম নিতে শুরু করবে। আর যখন লোকেরা ঋণ কম নেবে তখন ব্যাংকের অর্থবৃদ্ধিও কম হবে এবং মুদ্রার আবর্তনও কম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে রিজার্ভ ব্যাংক সূদের হার কম করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকও তার সুদের হার কমিয়ে দেবে। যার ফলে লোকেরা ঋণও বেশী নেবে এবং অর্থ বৃদ্ধিও বেশী হয়ে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

খ- সরকারের যখন অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন তা অর্জন করার নিমিত্তে বিভিন্ন ঋণের দস্তাবিজ জারী করে; যাকে সরকারী তমসুক বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক একটি বিল জারী করে; যাকে ইংরাজীতে TREASURY BILL বলে। একটি বিলের লিখিত মূল্য (FACE VALUE) এক শত টাকা হয়। এই বিল সাধারণতঃ ছয় মাসের জন্য জারী করা হয়; তা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়

করা হয়, আর কেবল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই তার প্রাথমিক ক্রেতা হয়ে থাকে।

নিলাম এই পদ্ধতিতে করা হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে দেয় যে, 'এত টাকা বা দৃষ্টান্তস্বরূপ একশ' কোটি টাকার ট্রেজারী বিল জারী করা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যাংক তখন বলে, 'আমি এত মূল্যে একটি বিল ক্রয় করতে চাই।' আজকাল এর রেট সাধারণতঃ ১৩ অথবা ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ ১০০ টাকার বিল সাধারণতঃ ৮৬ বা ৮৭ টাকায় বিক্রয় হয়। এবারে যে ব্যাংক এই বিল ৮৬ টাকায় ক্রয় করবে সে ছয় মাস পরে তার পুরাপুরি ১০০ টাকা ওসুল করে নেবে। আর ১৪ টাকা তার সূদ অথবা লাভ হবে।

যখন মুদ্রার মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, তখন রিজার্ভ ব্যাংক ট্রেজারী বিল স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করার প্রবণতা প্রকাশ করে। যার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজের পুঁজির বিনিময়ে বিল খরীদ করতে শুরু করে। এভাবে সকল ব্যাংকেরই অর্থ রিজার্ভ ব্যাংকে ফেরৎ আসতে আরম্ভ করে। আর ব্যাংকগুলোতে পুঁজি কম হয়ে যায়। ফলে ঋণ সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে অর্থ-বৃদ্ধির কাজও কমে যায়। ঠিক এর বিপরীত, যদি মুদ্রাস্ফীতি আনার প্রয়োজন হয়, তাহলে রিজার্ভ ব্যাংক ট্রেজারী বিল অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করার জন্য খোলা বাজারে এসে যায়। লোকেরা তখন নিজেদের বিল বিক্রয় করে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে নেয়। আর এভাবে মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে মান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

গ- নোট ছেপেও রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির উপর প্রভাবশীল হয়।[৫০]

৮- আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (INTERNATIONAL MONETARY FUND)ঃ-

এ ফান্ড স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে। যেভাবে একই দেশের কয়েকটি ব্যাংকের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক (রিজার্ভ ব্যাংক) থাকে, ঠিক সেভাবেই কয়েকটি দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল এই সংস্থা (I.M.F)। এটা যেন দুনিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক; যে সত্বর আদায়যোগ্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ সকল দেশকে সরবরাহ করে থাকে। কখনো কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হলেও সাময়িকভাবে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য

[50] *(ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ও তিজারাত দ্রষ্টব্য।)*

করার জন্য নগদ অর্থ তার নিকট নাও থাকতে পারে। এই মুহূর্তে উক্ত সংস্থা এ দেশকে ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

উক্ত সংস্থায় প্রত্যেক দেশের জন্য একটা নির্দিষ্ট কোটা (QUOTA) থাকে। ঐ দেশের বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে তুলনা করে দেখার পর এই কোটা নির্ধারিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়েছে ১০০ কোটি ডলারের এবং কোন এক দেশের বাণিজ্য হল পাঁচ কোটি ডলারের। তাহলে এই দেশ পাঁচ শতাংশ কোটা অর্জন করতে পারবে।

প্রত্যেক দেশই তার কোটার ২৫ শতাংশ অর্থ আকারে এবং ৭৫ শতাংশ দেশীয় মুদ্রা আকারে ঐ সংস্থায় জমা করে। এইরূপে I.M.F এর নিকট সকল দেশের মুদ্রা জমা হয়ে যায়। I.M.F এ ফান্ড জমা করার পর প্রত্যেক দেশই সেখান থেকে ঋণ নেওয়ার অধিকার লাভ করে। যাকে ইংরাজীতে DRAWING RIGHTS বলে। আবার এই DRAWING RIGHTS এর ভিত্তিতে যে ঋণ পাওয়া যায় তা কয়েক অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক একটা ভাগকে বলা হয় TRANCHE। প্রথম ট্রান্চ এ ঋণের ২৫ শতাংশ হয়ে থাকে যা বিনা শর্তে পাওয়া যায় এবং তাতে সূদও কম লাগে। কিন্তু এর পরের ট্রান্চগুলোতে শর্তাবলী এবং বাধ্য-বাধকতাও বেশী, আর এই তুলনায় সূদের অংকও বেড়ে যেতে থাকে।

৯- আন্তর্জাতিক ব্যাংক (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)ঃ-

এই ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত নাম হল বিশ্বব্যাংক (WORLD BANK) এবং বর্তমানে উক্ত নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই ব্যাংক এবং 'আই এম এফ' এর মাঝে পার্থক্য এই যে, 'আই এম এফ' স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদান করে; যার মেয়াদ বড়জোর তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে থাকে; যার মেয়াদ পনের থেকে ত্রিশ বছর হয়। প্রতিষ্ঠা লাভের পর শুরুর দিকে এই ব্যাংক বিভিন্ন কর্ম-প্রকল্প (PROJECTS) বাস্তবায়নার্থে ঋণ দিয়েছিল। যেমন, সেতুনির্মাণ, রাজপথ নির্মাণ প্রভৃতি। অতঃপর ১৯৬০ সালের পর থেকে সাধারণ ঋণ দিতেও আরম্ভ করল। বর্তমানে এই ব্যাংক পলিসি-নির্মাতা ঋণও দান করে থাকে; অর্থাৎ এই

বলে যে, যদি তুমি তোমার দেশের পলিসি (শাসন-প্রণালী বা কূটনীতি) এরূপ বানাও, তাহলে তোমাকে এত ঋণ দেওয়া হবে।

ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

মূলগত দিক থেকে ব্যাংক হল 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী'র নাম। ব্যাংক জনসাধারণকে তাদের অর্থ জমা ও গচ্ছিত রাখতে আহ্বান জানায়; যাকে ইংরাজীতে ডিপোজিট্স (DEPOSITS) বলা হয়। এই ডিপোজিট কয়েক প্রকারের হয়ঃ-

১- কারেন্ট একাউন্ট (CURRENT ACCOUNT বা চলতি আমানত)। এই একাউন্টে জমা রাখা টাকার উপর সূদ পাওয়া যায় না। এতে গচ্ছিত টাকা যে সময়ে ও যে পরিমাণে ইচ্ছা বিনা বাধায় তুলতে পারা যায়।

২- সেভিং একাউন্ট (SAVING ACCOUNT বা সঞ্চয়ী খাতা)। এই একাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য সাধারণতঃ বিভিন্ন নিয়ম ও শর্তাবলী থাকে। এই খাতায় ব্যাংক সূদ প্রদান করে।

৩- ফিক্স্ড ডিপোজিট (FIXED DEPOSIT বা স্থায়ী আমানত)। এতে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে টাকা তোলা যায় না। এই টাকার উপরও ব্যাংক সূদ দিয়ে থাকে। মেয়াদ অনুসারে হার নির্ণয় হয়। দীর্ঘ-মেয়াদের ক্ষেত্রে বেশী হারে এবং স্বল্প-মেয়াদের ক্ষেত্রে অল্প হারে সূদ পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত তিন প্রকার ডিপোজিটের মাধ্যমে যখন ব্যাংকের নিকট পুঁজি জমা হয় এবং প্রাথমিকভাবে তার নিকট যে পুঁজি থাকে, তা একত্রীভূত হয় তখন ঐ সমস্ত পুঁজিকে ব্যবহার করার পদ্ধতি এই হয় যে, উক্ত পুঁজির একটি নির্দিষ্ট অংশ চলতি রূপে রিজার্ভ ব্যাংকে জমা করা জরুরী হয়। রিজার্ভ ব্যাংকে এ পুঁজি সাধারণতঃ এমন সরকারী তমসুক (GOVERNMENT SECURITIES) রূপে জমা থাকে, যা সহজেই নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব হয় এবং তাতে কিছু সূদও পাওয়া যায়। এ ছাড়া ব্যাংক নিজের কাছেও কিছু চলতি অর্থ (LIQUID MONEY) রেখে নেয়; যাতে আমানতকারী (ডিপোজিটার)দের চাহিদাও পূরণ করতে পারে।

ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলী

পুঁজি জমা রাখার পর ব্যাংক কয়েক প্রকার ভূমিকা পালন করে; যেমন অর্থসংস্থান ও বিনিয়োগ করা, অর্থ-বৃদ্ধি করা, আমদানী ও রপ্তানীতে মধ্যস্থতা করা প্রভৃতি। এখন আমরা উক্ত ভূমিকাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবঃ-

১- অর্থ সংস্থান (FINANCING) ঃ- ব্যাংকের সব চাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জনসাধারণের প্রয়োজনে---বিশেষ করে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে--- ঋণ সরবরাহ করা। ব্যাংক কখনো দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ জারী করে; যাকে ইংরাজীতে LONG TERM CREDIT বলে। আবার কখনো স্বল্প-মেয়াদী ঋণ জারী করে থাকে; সাধারণতঃ তিন অথবা ছয় মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য দেওয়া হয়, যাকে ইংরাজীতে SHORT TERM CREDIT বলে।

ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি ঃ-

ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের এমন সীমাহীন এখতিয়ার থাকে না যে, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে এবং যত ইচ্ছা তত পরিমাণে ঋণ সরবরাহ করতে পারে। বরং রিজার্ভ ব্যাংকের তরফ থেকে একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। সেই সীমার অনুবর্তী হয়ে ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে পারে। উক্ত 'সীমা'কে ইংরাজীতে CREDIT CEILING বলা হয়। যেমন বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের তরফ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তা এই যে, ব্যাংক তার সমস্ত গচ্ছিত অর্থের ৪০ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংকে জমা রাখবে; যাকে ইংরাজীতে LIQUIDITY RESERVE বলে। এরপর ৫ শতাংশ নগদ CASH রূপে নিজের কাছে জমা রাখবে। ৩০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ দ্বারা ব্যক্তিগত কাউকে বা কোন সংস্থা বা কোম্পানীকে ঋণ সরবরাহ করবে। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ অর্থ থেকে সরকারী তমসুক (GOVT. SECURITIES) ক্রয় করবে, নতুবা সরকারী সংস্থাগুলোকে ঋণ সরবরাহ করবে ।

CREDIT CEILING এ সীমাবদ্ধ থেকে ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের পদ্ধতি এই হয় যে, সর্ব প্রথম ব্যাংক একটি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখে যে, যে ব্যক্তি ঋণ নিতে চায়, সে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে তা আদায় করতে পারবে কি না? সে ব্যক্তির জমি-জমা কত এবং তার মালিকানাধীন বিষয়-বস্তু কি? এই পরিসংখ্যান নেওয়ার পর ব্যাংক একটা সময়-সীমা নির্দিষ্ট

করে দেয় যে, এত সময়ের মধ্যে সে এত পরিমাণ অর্থ দিতে প্রস্তুত আছে; যা প্রয়োজন অনুপাতে সময় সময় নিতে পারা যাবে। ঋণের অর্থ-পরিমাণ সীমিত করাকে ইংরাজীতে SANCTION OF THE LIMIT বলে। পরিমাণ নির্ধারণের পর এ ঋণপ্রার্থী ব্যক্তির জন্য ব্যাংকে একটা একাউন্ট খুলে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে এ একাউন্ট থেকে তার যখন ও যত ইচ্ছা ঋণ নিতে পারে। এই একাউন্ট খোলার দরুন ব্যাংক খুবই স্বল্প (প্রায় ৫ শতাংশ) হারে সূদও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যখন সে ঋণ তুলে নেয়, তখন নিয়মিত হারে সূদ নিতে আরম্ভ করে।

আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে ব্যাংকের ভূমিকা ঃ-

ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে একটি কাজ এটাও যে, ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য মাধ্যম। ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব ও মারফৎ ব্যতীত আমদানী (IMPORT) রপ্তানী (EXPORT) সম্ভব নয়।

এর বিস্তারিত বিবরণে এই বলা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি বহির্দেশ থেকে কোন জিনিস আমদানী (IMPORT) করতে চায়, তখন সেই দেশের বণিক এ কথার নিশ্চয়তা চায় যে, যখন সে ঈপ্সিত বস্তু ক্রেতার নিকট পাঠাবে, তখন ক্রেতা সত্যসত্যই তার মূল্য আদায় করে দেবে। এ জন্যই আমদানী ও রপ্তানীকারীকে নিশ্চয়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে একটি জমানতনামা (যামিনপত্র) গ্রহণ করা হয়। এতে ব্যাংক বিক্রেতাকে একথার গ্যারান্টি দেয় যে, অমুক জিনিস অমুক ব্যক্তিকে বিক্রয় করা হলে মূল্য আদায়ের দায়িত্ব থাকবে ব্যাংকের উপর। একে ইংরাজীতে LETTER OF CREDIT বলা হয়। আবার সংক্ষেপে L/C বলে। ব্যাংক L/C প্রস্তুত করে রপ্তানীকারীর ব্যাংকে প্রেরণ করে। রপ্তানীকারীর ব্যাংককে (NEGOTIATING BANK) বলে। এবারে L/C পৌঁছনর পর ওখান (বিদেশ) থেকে মাল জাহাজে বুক করে দেওয়া হয়।

জাহাজ কোম্পানী মাল বুক হওয়ার একটি রসিদ জারী করে; যাকে BILL OF LADING (চালানি রসিদ) বলা হয়। অতঃপর রপ্তানীকারীর ব্যাংক উক্ত বিল অফ লেডিং সহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র L/C জারীকর্তা ব্যাংকে প্রেরণ করে। এবারে আমদানীকারী নিজের ব্যাংক থেকে এ সকল

কাগজাদি নিয়ে 'এল সি'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। যদি কাগজাদির বিবরণ এল সির অনুরূপ হয়, তাহলে এ কাগজাদি দেখিয়ে বন্দর থেকে মাল তুলে আনে। অবশ্য ব্যাংক সাধারণতঃ উক্ত কাগজাদি আমদানীকারীকে তখনই সোপর্দ করে, যখন সে মালের যথার্থ মূল্য আদায় করে দেয়।

অর্থ উৎপাদনের কাজ ঃ-

ব্যাংকের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল পূর্বে জমাকৃত অর্থে বৃদ্ধিসাধন করে অর্থের সম্প্রসারণ বাড়ানো এবং অর্থভান্ডারে উন্নতি সাধন করা। একেই বলা হয় অর্থ উৎপাদন করা। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলঃ-

লোকেরা যখন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তখন নগদ (নোট) আকারে নেওয়া নিস্প্রয়োজন মনে করে। বরং ঋণদানের সাধারণ নিয়ম এই হয় যে, ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে এক একাউন্ট খুলে তাকে চেক্ বই সোপর্দ করে। যাতে প্রয়োজনমত চেক্ লিখে এ চেক্ মারফৎ টাকা প্রদান করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকার লোন নিল। ব্যাংক তাকে ১ লাখ টাকা (নগদ নোট) দেওয়ার পরিবর্তে তার নামে ১ লাখ টাকার একাউন্ট খুলে চেক্বই প্রদান করে। এবারে যখনই যত টাকা আদায় করার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখনই সে চেক্ লিখে তা সহজে আদায় করতে পারবে। উপরোক্ত দুটি কথাকে সামনে রেখে গভীরভাবে চিন্তা করা হলে অনুমান হবে যে, ব্যাংকের নিকট যত পরিমাণ নোট মজুদ থাকে, তার চাইতে কয়েকগুণ অধিক মুনাফা লাভ করা হয়।

আর তা এইভাবে যে, যখন কোন ব্যাংকের নিকট কিছু নোট আসে, তখন সে রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ বের করে অবশিষ্ট টাকা ঋণপ্রার্থী লোকদেরকে ঋণ দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে, সে সাধারণতঃ নগদ টাকা (নোট) হিসাবে নেয়ই না, বরং একাউন্ট খুলে চেকবই নেই। পক্ষান্তরে নগদ হিসাবে নিলেও পুনরায় সে টাকা এ ব্যাংকে জমা করে দেয়। এভাবে যত টাকার অতিরিক্ত একাউন্ট খোলা হয় অর্থে ঠিক তত পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে নোট ততগুলোই থাকে, যতগুলো পূর্ব হতেই রাখা ছিল। পুনরায় ঋণগ্রহীতার একাউন্ট খোলার

প্রেক্ষিতে যে নতুন ডিপোজিট ব্যাংকে স্থান পেল, তার মধ্য থেকেও রিজার্ভ বের করে বাকী টাকা ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি পুনঃ এ টাকা এ ব্যাংকেই গচ্ছিত রাখে। এর ফলে অর্থে অতিরিক্ত সংযোজন ঘটে। এইভাবে অর্থে কয়েকগুণ বৃদ্ধি সাধন হয়। আর একেই বলা হয় অর্থ উৎপাদন। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যাংকে কোন এক ব্যক্তি ১০০ টাকা রাখল। ব্যাংক তা হতে ২০% অর্থাৎ ২০ টাকা রিজার্ভ ব্যাংককে দিয়ে অবশিষ্ট ৮০ টাকা কাউকে ঋণ দিয়ে দিল। ঋণগ্রহীতাও ঋণ নেওয়ার পর এ ব্যাংকেই তা জমা রাখল। এর ফলে ব্যাংকের মোট ১৮০ টাকার ডিপোজিট হয়ে গেল। এর ২০% অর্থাৎ ৩৬ টাকা (যার মধ্যে পূর্বেই ২০ টাকা দেওয়া হয়েছে, তাই বাকী আরো ১৬ টাকা) রিজার্ভ ব্যাংককে দিয়ে বাকী ৬৪ টাকা পুনরায় অন্য কাউকে ঋণ দেয়। আর সে ঋণগ্রহীতাও এ টাকা এ ব্যাংকে রাখলে তার ডিপোজিট আরো ৬৪ টাকা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ব্যাংকে ডিপোজিটের মোট অর্থ-পরিমাণ হবে ২৪৪ টাকা। পুনরায় এই অর্থের ২০% অর্থাৎ ৪৮.৮০ টাকা (যার মধ্যে ৩৬ টাকা পূর্বেই দেওয়া আছে আর বাকী ১২.৮০ টাকা) রিজার্ভ ব্যাংকে জমা করে বাকী ৫১.২০ টাকা পুনঃ অপর কাউকে ঋণ দেবে। আবার সে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি এ টাকা এ ব্যাংকেই রাখলে ব্যাংকের ডিপোজিট পরিমাণ দাঁড়াবে মোট ২৯৫.২০ টাকা।

এভাবে ব্যাংক আবারো ঋণদান করে। শেষ পর্যন্ত তার অর্থভান্ডার শূন্য থেকে যায়।

উপরোক্ত উদাহরণে ব্যাংকের মূলধন ছিল ১০০ টাকা। কিন্তু এ টাকা থেকে ২৯৫ টাকার মুনাফা অর্জন করা হল। প্রত্যেক ডিপোজিটহোল্ডার নিজ নিজ ডিপোজিটের ভিত্তিতে চেক জারী করতে পারে। অর্থাৎ ২৯৫ টাকার চেক জারী হতে পারে। অথচ মূলধন ছিল মাত্র ১০০ টাকা। সুতরাং অতিরিক্ত ১৯৫ টাকা ব্যাংকের উৎপাদিত অর্থ। আর ব্যাংকের এই কাজের নাম হল 'অর্থ উৎপাদন'।

উক্ত উদাহরণে যে কোন একটি ব্যাংককে ধরে নিয়ে বলা হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণ করে পুনরায় এ ব্যাংকেই তা জমা রাখবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরূপও হয়ে থাকে যে, সে এ ব্যাংক ছাড়া আরো অন্য কোন ব্যাংকে জমা রাখতে পারে। যার ফলে দ্বিতীয় ব্যাংকে ডিপোজিটে বৃদ্ধি

সাধন হবে। সে যাই হোক; জমা যে ব্যাংকেই করুক না কেন, ব্যাংক থেকে গৃহীত প্রত্যেক ঋণের পরিণামই হল কোন না কোন ব্যাংকের ডিপোজিটে বৃদ্ধি সাধন। অতএব এ ক্ষেত্রেও সকল ব্যাংকের সমষ্টি অর্থ উৎপাদনের কর্তব্য পালন করবে।

ব্যাংকের অর্থকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আর একটি জিনিসের খুব বেশী প্রভাব আছে। যাকে ব্যাংকিং পরিভাষায় FLOT (ফ্লোট) বলা হয়। ব্যাংকের নিকট যে টাকা ডিপোজিট স্বরূপ থাকে তার উপর ব্যাংককে সূদ দিতে হয়। এ সূদ হল ডিপোজিটের মাসুল (COST)। অর্থাৎ এত সূদ দিয়ে ব্যাংক এত ডিপোজিট অর্জন করে। কিন্তু কখনো কখনো টাকা কিছু সময়ের জন্য ব্যাংকে থাকলেও তা ডিপোজিটের পর্যায়ভুক্ত হয় না। আর তাতে ব্যাংককে সূদও দিতে হয় না। এ ধরনের টাকা ব্যাংকের এমন এক প্রকার অর্থ যার উপর কোন মাসুল বা খরচ আদায় করতে হয় না। এরূপ অবস্থা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে; যেমন, এক ব্যাংক অপর ব্যাংকের নামে চেক জারী করে। এবারে প্রথম ব্যাংক থেকে দ্বিতীয় ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর হতে কিছু সময় অবশ্যই লেগে যায়। অতএব এ সময়ের মধ্যে চেকে লিখিত এ টাকা ব্যাংকের FLOAT হয়ে যায়। এর আরো একটি উদাহরণ এরূপ; যেমন, ব্যাংক কাউকে কিছু টাকার ড্রাফ্‌ট দিলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ড্রাফ্‌ট ক্যাশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ টাকা ব্যাংকের নিকট 'ফ্লোট' হিসাবে থাকে।

এর আরো একটি উদাহরণ যেমন, ব্যাংক কারো নামে L/C জারী করলে এল সি জারীকর্তা তখনই টাকা আদায় করে দেয়। কিন্তু ব্যাংক অপর ব্যক্তি (রফতানীকারক)-কে সেই টাকা তখনই আদায় করে, যখন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এসে পৌঁছে যায়। সুতরাং এতটা সময় ধরে বিনা কোন খরচ আদায়ে সেই টাকা ব্যাংকের নিকট (ফ্লোট হিসাবে) থাকে।

অনুরূপ রেলওয়ের বিলটি (ছোট বিল) এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র ব্যাংকে আসে। ব্যাংকে টাকা পয়সা আদায় করে কাগজাদি নেওয়া হয়। কাগজাদি নিয়ে বিলটি ছাড়ানো হয়। এবারে কাগজাদি ব্যাংক থেকে নেওয়ার সময়েই টাকা ব্যাংকে আদায় তো করে দেওয়া হয়; কিন্তু বিলটি প্রেরকের নিকট এ টাকা পৌঁছতে বিলম্ব হয়। এ বিলম্বিত সময়ের মধ্যে এ টাকাও ব্যাংকের ফ্লোট।

হজ্জের জন্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়। এ ছাড়া আরো অন্যান্যভাবেও ফ্লোট হয়ে থাকে। এই ফ্লোটের মাধ্যমে ব্যাংক যথেষ্ট পরিমাণের পুঁজি অর্জনে সক্ষম হয়।

এই বিস্তারিত বিবরণে আরো একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাহ্যতঃ যা বুঝা যায় তাতে মনে হয়, ব্যাংক টাকা জমাকর্তাদেরকে যত পরিমাণে সূদ দেয়, তত পরিমাণে তার খরচও হয়। যেমন ৮% সূদ দিলে তার খরচও ৮% ই হয়। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাংকের বাস্তব খরচ তার চাইতে কমই হয়; যা সে সূদের খাতে ব্যয় করে থাকে। কারণ ব্যাংকের নিকট বহু অর্থ এমনও থাকে যার উপর কোন প্রকার সূদ আদায় করতে হয় না। উপরন্তু তার থেকে মুনাফা লাভ করা হয়। এ ধরনের অর্থ প্রথমতঃ ফ্লোটের, আর দ্বিতীয়তঃ কারেন্ট একাউন্টের। এ থেকে বুঝা গেল যে, ব্যাংক যে পরিমাণে লাভ অর্জন করে তার ৮ শতাংশ অপেক্ষা কম অংশ সাধারণ আমানতকারীদের ভাগে আসে। অতএব বলা যায় যে, ব্যাংকের লাভের উচ্ছ্বসিত গতিমুখ জনসাধারণের দিকে কম থাকে, আর ধনাঢ্য পুঁজিপতিদের দিকে থাকে বেশী। আর এইভাবে ব্যাংক সমগ্র জাতি এবং সারা দেশ বরং সারা দুনিয়ার অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। আর আপাতদৃষ্টিতে টাকা জমাকর্তাদেরকে স্বল্প সূদ দিয়ে খোশ করে দেয়; কিন্তু তলায় তলায় সমগ্র জাতির ধন-দৌলত হস্তগত করে ডাকাতের ভূমিকা পালন করে।

প্রিয় পাঠক! ব্যাংকের যাবতীয় কর্মপ্রণালী এবং কারবারের প্রকৃতি ও ধরন বিস্তারিতভাবে আপনার সামনে পেশ করা হল। আপনি আরো একবার মন দিয়ে গভীরভাবে পড়ুন। তাতে দেখবেন ও ভালোরূপে বুঝতে পারবেন যে, ব্যাংকের বুনিয়াদ ও ভিত্তিই হল সূদ। বরং সে সম্পূর্ণ সূদের উপরেই নির্ভরশীল এবং সূদী ইমারতের উপরেই তার গঠনমূলক কাঠামো কায়েম থাকে। আসুন এবারে ব্যাংক কিভাবে ও কেমন করে জাতি, দেশ এবং সারা দুনিয়ার উপর ধ্বংসের জাল বিছিয়ে রেখেছে এবং সারা দুনিয়া তার সেই জালে ফেঁসে আছে তা আমরা সমীক্ষা করে দেখি।

ব্যাংকের ধ্বংসকারিতা

ব্যাংকের আলোচনা প্রসঙ্গে মওলানা মওদূদী (রঃ) লিখেছেন, "এভাবে পুঁজিপতিদের সংগঠন কায়েম হওয়ার পর প্রথম যুগের একক ও বিক্ষিপ্ত মহাজনদের তুলনায় বর্তমানের একত্রীভূত ও সংগঠিত পুঁজিপতিদের মর্যাদা, প্রভাব ও অবস্থা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে এবং এর ফলে সারা দেশের ধন-সম্পদ তাদের নিকট কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। আজকের দিনে এক একটি ব্যাংকে শত শত কোটি টাকা জমা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রভাবশালী পুঁজিপতি এগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ পদ্ধতিতে তারা কেবল নিজের দেশের নয় বরং সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক, তমদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর চরম স্বার্থান্ধতা সহকারে কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এদের শক্তিমত্তা আন্দাজ করার জন্য কেবল এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পূর্বে ভারতের বড় বড় ব্যাংকগুলোর অংশীদারদের সংগৃহীত পুঁজির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৭ কোটি টাকা, কিন্তু আমানতকারীদের গচ্ছিত পুঁজির পরিমাণ ৬১২ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়ে ছিল। এ ব্যাংকগুলোর সমগ্র শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল বড়জোর দেড়-দু'শ পুঁজিপতির হাতে। কিন্তু একমাত্র সূদের লোভে দেশের লাখো লাখো লোক এ বিপুল পরিমাণ অর্থ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং এ শক্তিশালী অস্ত্র তারা কখন কোথায় কিভাবে ব্যবহার করে, সে ব্যাপারে কারোর কোনো চিন্তাই ছিল না। যে কোন ব্যক্তি অনুমান করতে পারে, যে সব পুঁজিপতির হাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে গেছে তারা দেশের শিল্প, ব্যবসায়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি-সভ্যতার উপর কত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ প্রভাব দেশ ও দেশবাশীর স্বার্থে কাজ করছে, না এ সব স্বার্থান্ধ পুঁজিপতিদের নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে ব্যয়িত হচ্ছে তাও সহজেই অনুমান করা যায়।

এ পর্যন্ত এমন এক দেশের অবস্থা বর্ণনা করলাম যেখানে পুঁজিপতিদের সংগঠন এখনো সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং ব্যাংকগুলোর মোট আমানত সমস্ত জনসংখ্যার মাথাপিছু মাত্র ৭ টাকা করে পড়ে। এখন এই প্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের কথা চিন্তা করুন, যেখানে এ

হার মাথাপিছু হাজার দু'হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। চিন্তা করুন সেখানে পুঁজি কেন্দ্রীয়করণের কি অবস্থা। ১৯৩৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবলমাত্র ব্যবসায়িক ব্যাংকগুলোর আমানতের হার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ১৩১৭ পাউন্ড, ইংল্যান্ডে ১৬৬৪ পাউন্ড, সুইজারল্যান্ডে ২৭৫ পাউন্ড, জার্মানীতে ২১২ পাউন্ড ও ফ্রান্সে ১৬৫ পাউন্ড ছিল। এ দেশগুলোর অধিবাসীরা এত ব্যাপক হারে ও বিপুল পরিমাণে নিজেদের অতিরিক্ত আয় ও সঞ্চিত পুঁজি তাদের পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। প্রতিটি গৃহ থেকে সংগৃহীত এ বিপুল পরিমাণ অর্থ মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। যাদের নিকট এগুলো কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাদেরকে কারোর নিকট জবাবদিহি করতে হয় না, নিজেদের প্রবৃত্তি ছাড়া অন্য কারোর নির্দেশও তারা গ্রহণ করে না এবং নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন দিকে তাদের দৃষ্টিও নেই। তারা কেবলমাত্র সামান্য সূদের আকারে এ বিরাট-বিশাল ধনাগারে 'ভাড়া' আদায় করে যাচ্ছে এবং বাস্তবে তারাই এর মালিকে পরিণত হচ্ছে। অতঃপর এ শক্তির জোরে তারা বিভিন্ন দেশের ও জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলা করে; তারা ইচ্ছামত যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, তারা ইচ্ছামত দু' দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়, আবার ইচ্ছামত যে কোন সময় সন্ধি স্থাপন করায়। নিজেদের অর্থ-লিপ্সার দৃষ্টিতে যে জিনিসটিকে তারা বাঞ্ছনীয় মনে করে তার প্রচলন বাড়ায় ও বিকাশ সাধন করে, আবার যেটিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে তার বিকাশ লাভের সমস্ত পথই বন্ধ করে দেয়। তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মচর্চা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট--সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ দেশের ও জাতির সমুদয় অর্থ তাদের 'পায়ের ভৃত্যে' পরিণত হয়েছে।

এ মহা বিপর্যয়ের ধ্বংসলীলা দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণই শিউরে উঠেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চ কলরোল ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে; একটি অতি ক্ষুদ্র দায়িত্বহীন স্বার্থান্ধ শ্রেণীর হাতে ধনের এ বিপুল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া সমগ্র সমাজ ও জাতীয় জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো বলা হচ্ছে, সূদের কারবার তো ছিল পুরনো আমলের আড়তদার মহাজনদের অপবিত্র ও হারাম কারবার।

আজকের যুগের উন্নত রুচিশীল ও সুসভ্য ব্যাংকারগণ অত্যন্ত পূত-পবিত্র কারবার করছেন। তাদের ব্যবসায়ে অর্থ খাটানো এবং তা থেকে নিজের অংশ নেয়া হারাম হবে কেন? অথচ পুরনো মহাজন ও আজকের এ ব্যাংকারদের মধ্যে যদি সত্যিই কোনো পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে, তাহলে তা কেবল এতটুকু যে, তারা একা একা ডাকাতি করতো আর এরা দলবল জুটিয়ে, ডাকাতদের বড় বড় দল গঠন করে, দলবদ্ধভাবে ডাকাতি করছে। এদের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটি হচ্ছে পুরনো ডাকাতদের প্রত্যেকেই দরজা ও দেওয়াল ভাঙার যন্ত্রপাতি এবং মানুষ মারার অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই আনতো, কিন্তু আজ সমগ্র দেশবাসী নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও আইনের শৈথিল্যের কারণে অসংখ্য যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরী করে 'সামান্য ভাড়ায়' সংঘবদ্ধ ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছে। দিনের বেলায় তারা জনগণকে 'ভাড়া' আদায় করে আর রাতের আঁধারে এ জনগণের উপর তাদের প্রদত্ত যন্ত্র ও অস্ত্রের সাহায্যে ডাকাতি করে।

এহেন 'ভাড়া'কে হালাল ও পবিত্র গণ্য করার জন্য আমাকে বলা হচ্ছে।"[৫১]

ব্যাংকের বৈধ কার্যাবলী

ব্যাংক প্রসঙ্গে যে সমালোচনা করা হল তার অর্থ এই নয় যে, ব্যাংকের সারা কাজ-কারবারই ভুল, নাজায়েয ও হারাম এবং এর সহিত কোন প্রকারেরই লেনদেন বৈধ হতে পারে না। কারণ ব্যাংক অনেক এমন কল্যাণকর ও বৈধ কর্মও সম্পাদন করে থাকে, যা বর্তমান যুগের কৃষ্টিময় জীবন এবং লেনদেন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপকারী বটে এবং জরুরীও। বস্তুতঃ ব্যাংকও আধুনিক সভ্যতার আলোকে গড়ে উঠা বহু জিনিসের মতই এমন এক উপকারী জিনিস যাকে শুধুমাত্র একটি শয়তানী উপাদান (সূদ) এর মিশ্রণ নোংরা করে রেখেছে।

এ ব্যাপারে ব্যাংক যে সকল বৈধ খিদমত আঞ্জাম দেয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করি ঃ-

---

[51] (সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ৮১ - ৮৩ পৃষ্ঠা)

১- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা স্থানান্তর করা, অনুরূপ এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে টাকা ট্রান্সফার করা। অবশ্য এর বিনিময়ে ব্যাংক সামান্য ফী গ্রহণ করে থাকে। যা ভাড়া বা মজুরীর পর্যায়ভুক্ত, আর তা দেওয়া-নেওয়া নিশ্চয়ই বৈধ।

২- ট্রাভেল চেক (TRAVEL CHEQUE) জারী করাঃ- যে ব্যক্তি এক রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন রাষ্ট্রে সফর বা ভ্রমণ করে তার এ রাষ্ট্রে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই পড়ে। এ ক্ষেত্রে সে ব্যাংকে নগদ টাকা জমা করে ট্রাভেল চেক সংগ্রহ করে; যা সে যে কোন জায়গায় ভাঙ্গিয়ে (যত টাকা জমা দিয়েছিল) তত টাকাই গ্রহণ করতে পারে। আর এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে নিজের সাথে নগদ টাকা নিয়ে বেড়ানোর চাইতে অধিকতর সহজ এবং নিরাপত্তামূলক।

৩- আয়রন-চেষ্ট বা লক ভাড়া দেওয়াঃ- যদি কোন ব্যক্তি (নিরাপদ) আয়রন-চেষ্ট বা লকে টাকা পয়সা অথবা সোনা-দানা রাখতে চায়, তাহলে সে তা ব্যাংক থেকে ভাড়া নিতে পারে।

৪- কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করাঃ- কোম্পানী চাইলে ব্যাংক কোম্পানীর নিকট মজুরী নিয়ে তার শেয়ার বিক্রয় করে দেয়।

৫- বৈদেশিক লেন-দেন (বা আমদানী ও রফতানী) সংক্রান্ত সুবিধাজনক ও সহজভাবে পারস্পরিক সরবরাহ করাঃ- ব্যাংকের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা। উক্ত বিনিময় সুবিধার মাধ্যমে ব্যাংক বহির্দেশের সাথে (ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি) আদান-প্রদানকারীদেরকে বহু প্রকার অসুবিধা, হয়রানি ও কষ্ট থেকে অব্যাহতি ও আরাম প্রদান করে। যেমন, ব্যাংক তাদের তরফ থেকে মূল্য আদায় করে, পণ্য-রফতানীর কাগজাদির দায়িত্ব নিজে বহন করে। আর এসব কর্ম ব্যাংক কিঞ্চিৎ মজুরীর বিনিময়ে সম্পাদন করে থাকে। যা দেওয়া নেওয়া বৈধ।

৬- ঋণ আদায় করাঃ- এই ঋণ আদায় করার নিয়ম এই যে, ঋণদাতা লোকেরা ব্যাংকের নিকট তাদের কাগজ-পত্র জমা করে এবং তার উপর স্বাক্ষর করে ব্যাংককে সোপর্দ করে দেয়। যাতে ব্যাংক নিজের মজুরী নিয়ে তাদের ঋণ আদায় করে দেয়। (আল মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ ৩৮-৩৯ পৃঃ)

৭- আকলপত্র (LETTERS OF CREDIT) খোলা। বিনা সূদে এল সি খোলার উপর ব্যাংক যে ফী নেয় তা বৈধ।

ব্যাংকের সূদকে হালালকারীদের বিভিন্ন দলীল ও তার জবাব

কতক লোক বড় জোরশোর করে এই আওয়াজ তুলছে যে, সাম্প্রতিক কালে সূদ ব্যাপক বিপত্তির আকার ধারণ করেছে, (যা থেকে বাঁচা কঠিন।) আর এ কথাও বারংবার আওড়ানো হয়ে থাকে যে, সূদ অর্থনীতির বিভিন্ন বুনিয়াদের মধ্যে একটি শক্তিশালী বুনিয়াদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কেননা সমস্ত রকমের বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কোম্পানীই সূদী কারবার করে থাকে; যার প্রতি উম্মাহ ও জাতি একান্ত মুখাপেক্ষী। আর ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন কারবার ও লেন-দেন না করা জাতির স্বার্থের প্রতিকূল। কারণ এমন লেনদেন একান্ত জরুরী ও অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়েছে। তাই মুসলমান যদি ব্যাংক থেকে দূরে থাকে, তাহলে আর্থিক দিক দিয়ে তারা চরম অবনতির শিকার হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতি তাদের চাইতে বহু আগে উন্নতির শিখরে অবস্থান করবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে উক্ত ধরনের লোভ ও লোলুপতার শিকার হয়ে অনেকে ব্যাংকের সূদকে জায়েয ও হালাল প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করে থাকেন। এ জন্যই তাঁরা ভুল, বিভ্রান্তিকর, অসঙ্গত এবং অযথা দলীল উপস্থাপন তথা ভুয়া যুক্তি ও অযথার্থ কিয়াস পেশ করেন।

আসুন, এখানে আমরা তাঁদের এ দলীলসমূহকে পরখ ও বিবেচনা করে দেখি, যা প্রকৃতপক্ষে (ব্যাংকের সূদ হালালের) দলীলই নয়; বরং তা (দলীল বলে) এক প্রকার ভুল ধারণা ও সন্দেহ। আমরা তাঁদের সন্দিগ্ধ দলীলসমূহ ও ভ্রম ধারণাগুলোকে এক এক করে পেশ করে তার প্রকৃতত্ব, যথার্থতা ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করছি ঃ-

১- ব্যবসায় উভয়পক্ষের সম্মতি এবং ব্যাংকের সূদঃ-

আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করে খেতে পার।[৫২]

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ব্যাংকের সূদকে অনেকে হালাল বলে প্রতিপাদিত করতে অপচেষ্টা করেছেন। কারণ ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে, তাতে কেউ কাউকে শোষণও করে না এবং কেউ কারো উপায়হীন অবস্থাকে তার লাভের সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহারও করে না।

এটা একটি সন্দেহ ও ভ্রম ধারণা মাত্র; যাতে ব্যাংকের সূদ হালালকারীদল জড়িত হয়ে পড়েছেন। নচেৎ প্রত্যেক মানুষই জানে যে, সাধারণ সম্মতি কোনও (হারাম) জিনিসকে হালাল করে দেয় না; বরং সেই সম্মতিই হালাল করতে পারে, যে সম্মতির সাথে ইলাহী নির্দেশ বা শরীয়তের কোনও নির্দেশ তার পরিপন্থী না হয়। যেমন একটি যুবক ও একটি যুবতী যদি যৌনক্রিয়ায় সম্মতি প্রকাশ করে এবং কেউ কাউকে সে কাজে বাধ্য না করে, তাহলে উভয়ের সম্মতির দরুন কি উভয়ের যৌনক্রিয়া (ব্যভিচার) বৈধ হয়ে যাবে? একটি সামান্য জ্ঞানের মানুষও অবশ্যই বলবে যে, উভয়ে রাজি হয়ে গেলেই ব্যভিচার বৈধ ও জায়েয হতে পারে না। অনুরূপভাবে যদি ব্যাংক ও আমানতকারী (টাকা জমাকর্তা) সূদ নেওয়া-দেওয়ার উপর রাজি ও সম্মত হয়ে যায়, তবুও উভয় পক্ষের উক্ত সম্মতিক্রমে সূদ হালাল হতে পারে না; বরং ব্যাংক যদি জমাকর্তাকে সূদ নিতে বাধ্য করে, তাহলেও সূদ হারামই থাকবে; হালাল হয়ে যাবে না। কারণ সম্মতি ও খুশীর সাথে নেওয়া হোক অথবা চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নেওয়া হোক---উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা সূদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন।

২- ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ব্যাংকের সূদ ঃ-

[52] (সূরা নিসা ২৯ আয়াত)

ব্যাংকের সূদকে হালালকারিগণ এই বলেন যে, কুরআন ও হাদীসে যে সূদকে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হল সেই ঋণের উপর সূদ--যা মানুষ তার ব্যক্তিগত অভাব ও প্রয়োজন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে (ঋণ) গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন মিটানো বা ক্ষুন্নিবারণের উদ্দেশ্যে অথবা ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঋণ করে যে সূদ দিতে হয়, সেই সূদই ঋণদাতার পক্ষে হারাম। কারণ এতে গরীব শোষণ হয় এবং অভাবীর অভাবকে অর্থকরী সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর সূদখোর বলে, 'যদি তুমি একশ টাকায় মাসে ১০ টাকা হারে সূদ দাও তাহলে আমি ঋণ দেব।' পরন্তু অভাবী মানুষ বাধ্য হয়েই সেই চুক্তিতেই ঋণ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়, তার সূদ হারামের আওতাভুক্ত নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে অভাবী বা গরীব শোষণ হয় না। বরং উভয় পক্ষই এ ঋণে লাভবান হয়।

ডক্টর নূরুদ্দীন ইত্‌র লিখেছেন, সাম্প্রতিককালে কোন কোন ব্যক্তি বলে থাকেন যে, কুরআন শুধু মাত্র সেই ঋণভিত্তিক সূদকে হারাম ঘোষণা করেছে যা একজন অভাবী ও উপায়হীন মানুষ ঋণের উপর আদায় করতে বাধ্য হয়। যাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীর ঋণভিত্তিক সূদকে হারাম করা হয়নি; যা মুনাফা কামানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের উপর আদায় করা হয়; যাকে বাণিজ্যিক ঋণ বলে আখ্যায়ন করা হয়। (এবং কুরআন অবতীর্ণকালে এরূপ বাণিজ্যিক সূদ প্রচলিত ছিল না।)

বলা বাহুল্য, এটি (সূদ হারামের) আয়াতের তফসীরে একটি অভিনব রায়। এই রায় পোষণ করে ওঁরা কুরআন মাজীদের স্পষ্ট উক্তিকে অকেজো ও বেকার করে ছেড়েছেন! উপরন্তু ১৪ শতাব্দী ধরে উলামায়ে তফসীর, উলামায়ে ফিক্‌হ, উলামায়ে লুগাহ (আরবী ভাষাবিদগণ) তথা ইসলামের ঈমামগণ উক্ত আয়াতের যে মমার্থ উপলব্ধি করেছেন, ওঁরা তার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আমরা ওঁদেরকে চ্যালেঞ্জ করে দাবী করছি যে, ওঁরা পূর্ব অথবা পরবর্তী উলামাদের কারো একটি উক্তি, নতুবা কমপক্ষে

তার কাছাকাছি কোন ইঙ্গিত, অথবা নিম্নমানের কোন আলেমেরই কোন উক্তি তাঁদের এ অভিমতের সমর্থনে পেশ করুন।[৫৩]

হ্যাঁ; চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আলেম ফকীহ বা ইমাম এ কথা বলে যান নি (যে, বাণিজ্যি-ভিত্তিক ঋণের সূদ উক্ত হারামের আওতাভুক্ত নয়)। যখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে রাজত্ব শুরু করেছে, তখন থেকে এ কথা বলা শুরু হয়েছে। অথচ এই নতুন অপব্যাখ্যায় কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিসমূহকে বিনা দলীলে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সঠিক ইতিহাস উক্ত অপব্যাখ্যার খন্ডন করে। কারণ জাহেলিয়াতের যুগে যে সূদ প্রচলিত ছিল তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত এমন ঋণভিত্তিক সূদ ছিল না; যা সে যুগের লোকেরা নিজেদের পানাহার বা ব্যক্তিগত অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করত এবং তার উপর সূদ আদায় করত। এ কাজ আরবদের সাধারণ প্রকৃতির পরিপন্থী ছিল। হ্যাঁ, সে যুগে এ ধরনের সূদী ঋণ যদিও প্রচলিত ছিল; তবে তা ছিল বিরল ঘটনা। বস্তুতঃ সে যুগে যে সূদ বহুল প্রচলিত ছিল, তা হল সেই বণিক্দের সূদ; যারা কুরআন মাজীদের বিবৃতি অনুযায়ী একবার শীতকালে এবং অন্যবার গ্রীষ্মকালে বাণিজ্যিক কাফেলারূপে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত। (সূরা কুরাইশ দ্রষ্টব্য) লোকেরা ধনবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অংশীদারী বা পার্টনারশিপ হিসাবে এ সকল কাফেলাকে নিজেদের অর্থ ব্যবসায় লাগাতে দিত। অথবা তাদেরকে ঋণ স্বরূপ অর্থ প্রদান করত এবং তার মুনাফা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে নেওয়া হত; যার অপর নাম ছিল সূদ। এই শ্রেণীর সূদ ছিল নবী করীম ﷺ-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আন্হুর। যা তিনি বিদায়ী হজ্জের সময় বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। কোনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ কথা কল্পনাও করতে পারে না যে, আব্বাস (রাঃ); যিনি জাহেলিয়াত যুগে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দ্বারা হাজীদেরকে পানি পান করাতেন, তিনি লোভাতুর ইয়াহুদীদের মত ব্যবহার প্রদর্শন করতেন এবং কোন ব্যক্তি তার

[53] (আল-মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ ৭৩পৃঃ)

নিজের ব্যক্তিগত অভাব অনটনের ফলে তাঁর নিকট ঋণ চাইতে এলে তিনি তাকে বলতেন, 'আমি সূদ ছাড়া তোমাকে ঋণ দিতে পারব না।'

যদি এ কথা তর্কছলে মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের হারামকৃত সূদ কেবলমাত্র ব্যক্তিক অথবা পারিবারিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণভিত্তিক সূদই ছিল; যেমন আধুনিককালের কতক দাবীদারের দাবী, তাহলে সূদদাতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভিশাপ দেওয়ার কারণ কি হতে পারে? আর এ কথা কি কল্পনাও করা যেতে পারে যে, একজন অনাহারক্লিষ্ট উপায়হীন অসহায় মানুষ যখন নিজের তথা নিজের ক্ষুধার্ত সন্তান-সন্ততির অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে কারো নিকট ঋণ করে এবং সে তার উপর সূদ প্রদান করে, তখন তাকেও আল্লাহর প্রিয়তম নবী ﷺ অভিশাপ দেবেন? বরং এ ধরনের উপায়হীন প্রয়োজনে তো আল্লাহ এবং তদীয় রসূল ﷺ হারামকৃত মৃত জন্তু, রক্ত এবং শুকরের মাংস খাওয়াকেও বৈধ ঘোষণা করেছেন; আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (মৃতজন্তু, শুকরের মাংস ইত্যাদি হারামকৃত বস্তু ভক্ষণ করতে) অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না।[৫৪]

পক্ষান্তরে এ কথাও প্রকৃত বাস্তব থেকে বহু ক্রোশ দূরে যে, ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগমূলক কর্মে অর্থ লাগিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ব্যাংকসমূহের বাজেট ও কার্য-বিবরণী সংক্রান্ত আলোচনা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ব্যাংক মৌলিকভাবে কেবলমাত্র ঋণদানের কাজ করে থাকে। এর মূল কারবার ক্রয়-বিক্রয়, কৃষিকার্য, শিল্পায়ন, ব্রিজ ও অট্টালিকা নির্মাণ প্রভৃতি নয়। একে সংক্ষিপ্ত ভাষায় এও বলতে পারেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আসল কারবার হল, যায়দ, উমার, বকরের নিকট থেকে স্বল্প (প্রায় ৮ শতাংশ) হারে সূদের উপর ঋণ নিয়ে অপরকে অধিক (প্রায় ১৫ শতাংশ) হারে ঋণ প্রদান করা। আর এ দুই হারের মধ্যবর্তী

[54] (সূরা বাকারাহ ১৭৩ আয়াত)

অবশিষ্ট অংশ (প্রায় ৭ শতাংশ) ব্যাংকের মুনাফা। এটাই হল ব্যাংকের আসল কারবার এবং মৌলিক বৃত্তি। এইভাবেই ব্যাংক বড় আকারের চক্রবৃদ্ধিহারে সূদী কারবার করে থাকে, যা জাহেলিয়াত যুগের ছোট ছোট মহাজনরা করত। এ কথাও বলা যায় যে, ব্যাংক হল সূদের এজেন্ট ও দালাল; যে সূদ দেয় এবং নেয়ও।

আর এই ধারণাও নিশ্চিতভাবে সঠিক নয় যে, ব্যাংক কখনোই নোকসান ও ক্ষতির শিকার হয় না; বরং সর্বদাই ব্যাংক লাভ অর্জনই করে থাকে। আমরা সংবাদপত্রে কত দেশের ব্যাংকের ব্যাপারে পড়েছি যে, তা দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। সেই আমেরিকা যাকে ব্যাংক ও পুঁজিপতিদের দেশ বলা হয়, শুধুমাত্র সেখানেই ১৯৮৭ সালে ১৪৭টি ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার খবর সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হয়। পুনরায় ঠিক তার পরবর্তী ২ বছরেও প্রায় অতগুলো ব্যাংকেরই দেউলিয়া হয়ে পড়ার কথা খবরের কাগজে বের হয়।[৫৫]

পরন্তু যদি আমরা এ কথা মেনে নিই যে, ব্যাংকের কোন প্রকার নোকসান ও ক্ষতিই হয় না---যেমন আমাদের কতিপয় ভাই বলে থাকেন- তাহলে ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রেও কি তাঁরা এ একই কথা বলবেন যে, তাদেরও কোন প্রকার নোকসান হয় না? (সর্বদা লাভই হয়?) সুতরাং যদি ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহীতাদের নোকসান হয়---যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা তার সাক্ষী---তাহলে তারা একাকী কেন নোকসান বহন করবে এবং ব্যাংক সর্বক্ষেত্রে কেবল লাভ অর্জন করবে? এটা কি ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা? বিবেক কি এমন একতরফা বিচারকে বৈধ ও সঠিক বলে মেনে নিতে পারে? আমরা যদি কেবল ঋণের বিপত্তির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এ ব্যাপারে বিভিষিকাময় দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। যে ঋণ তৃতীয় বিশ্বের কোমর ভেঙ্গে পঙ্গু অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এমন কি কেবল মিসরের মত একটি দেশের ঋণ চার হাজার চার শ' (৪৪০০০,০০০,০০০) কোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে! যার সূদ ১০% হারে ধরা হলে চার শ' চল্লিশ কোটি ডলার হয়। অথচ কিছু ঋণের সূদ ১০% থেকেও বেশী। যে ঋণ পরিশোধ করতে মিসর অক্ষম।

---

[55] (ফাওয়াইদুল বুনূক হিয়ার রিবাল হারাম, ডক্টর ইউসূফ কারযাবী ৩৫ পৃঃ)

এই প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ঋণের ডিউটি আদায়; অর্থাৎ আসল কিস্তী সহ অতিরিক্ত বার্ষিক সূদের টাকা পরিশোধ করা। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিই বড় বড় শক্তিশালী বহু দেশেরই মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। সুতরাং ভারত-পাকিস্তানের মত উন্নয়নশীল দেশের কি অবস্থা তা অনুমেয়। ঋণের ব্যাপারে একটি আরবী প্রবাদ আছে যে, همّ بالليل ومذلة بالنهار অর্থাৎ, ঋণের কারণে দুশ্চিন্তায় রাত্রের নিদ্রা হারাম হয়ে যায় এবং দিনে অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়।

আর এ হাল তো কেবল ঋণের। এবারে ঋণের সাথে তার সূদ যোগ হলে কত যে নাজেহাল হতে হয়, তা বলাই বাহুল্য। যে সূদ দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে এবং কম হওয়ার কোন নামই নেয় না।

সূদে দু'টি মসীবত সমবেত হয়; এক তো ঋণের বোঝা আর দ্বিতীয় হল ঋণদাতার অনুগ্রহ-পদে দলিত হওয়া। আমরা বিশ্বব্যাংক এবং পাশ্চাত্যের ঋণদাতা দেশগুলোর আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কি লক্ষ্য করছি না যে, কিভাবে তারা আমাদের রুজী-রুটী ও খাদ্যসম্ভারের উপর আধিপত্য জমিয়ে বসে আছে? এবং কিভাবে তারা আমাদের রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপর তাদের শাসন-ক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে?

৩- টাকা জমাকর্তাদের সহিত ব্যাংকের সম্পর্ক ঃ

ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখে, সে টাকা তারা ব্যাংকে ঋণস্বরূপ প্রদান করে, নাকি আমানতস্বরূপ গচ্ছিত রাখে তা প্রথমে নির্ধারণ হওয়া উচিত। এবারে আমানতস্বরূপ যে জিনিস রাখা হয়, তা চুরি হয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা কোন প্রকার নষ্ট হয়ে গেলে আমানতদার (যার কাছে আমানত রাখা হয় সে) এ জিনিসের জমানত বা দায়িত্ব নেয় না। তার জন্য সে গচ্ছিত (বিনিময়ে) জিনিস ফিরিয়ে দেওয়াও জরুরী নয়। তবে হ্যাঁ, সে যদি আমানতে খেয়ানত করে (নষ্ট করে) বা রক্ষণা-বেক্ষণে অবহেলা ও ত্রুটি প্রদর্শন করে, তাহলে কিন্তু সে এ জিনিসের যামিন হবে এবং তাকে তার খেসারত আদায় করতে হবে। আর এতে কোন দ্বিমত নেই যে, ব্যাংক জমাকর্তাদের টাকার যামিন থাকে। সুতরাং বুঝা গেল কোন অবস্থাতেই সে টাকা ব্যাংকের নিটক আমানতস্বরূপ নয়। আর যে ব্যক্তি যে

জিনিসের যামিন হয়, সে তার লাভনোকসানের অধিকারীও হয়। কেননা নবী করীম ﷺ বলেন, الخراج بالضمان অর্থাৎ, যমানত নেওয়ার কারণেই ক্ষতিপুরণ (যামিনদারের দায়িত্ব)।[৫৬]

পক্ষান্তরে যদি ব্যাংকের নিকট অলঙ্কার, সোনারূপা মণিমুক্তা বা জমি ইত্যাদির কাগজ-পত্র (লকে) রাখা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত জিনিসগুলো আমানত গণ্য হবে এবং সে গুলোকে ঠিক যেরূপে রাখা হয়েছিল সেরূপেই আমানতকারীকে ফেরৎ দেওয়া ব্যাংকের জন্য জরুরী।

এতদ্ব্যতীত এ কথাও বলা যথার্থ নয় যে, 'ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা যে ব্যাংককে ঋণ দিচ্ছে---সে কথা ঘুণাক্ষরে আদৌ কল্পনা করে না। তাছাড়া ব্যাংক তো কোটি কোটি টাকার মালিক। অতএব তাকে ঋণ দেওয়ার কথা ধারণা বহির্ভূত। (আর ব্যাংক কারো নিকট ঋণ চাইতেও যায় না।)' এরূপ বলা যথার্থ নয় এই জন্য যে, ঋণ দেওয়া-নেওয়ার শর্তাবলীতে কেবল ধনীরাই গরীবদেরকে ঋণ দেবে---এ কথা নেই। গরীব মানুষও ধনীকে ঋণ দিতে পারে। যেমন মুখাপেক্ষী মানুষ চির অমুখাপেক্ষী প্রতিপালক আল্লাহকে ঋণ দিয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ঃ

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً﴾

অর্থাৎ, কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?[৫৭]

এ ছাড়া ঋণ দেওয়া-নেওয়ার শর্তাবলীর পর্যায়ভুক্ত এ কথাও নয় যে, উভয় পক্ষকে ঋণ মনে করে অর্থ দিতে অথবা নিতে হবে। কারণ কখনো কখনো আমানতের মাল ঋণের রূপ পরিগ্রহ করে---যদিও মালের মালিকের ঋণ দেওয়ার নিয়ত থাকে না। যেমন, আমানতদার যখন আমানতের মালে তার নিজস্ব অধিকার প্রয়োগ (তাসার্রুফ) করবে---যেমন ব্যাংক করে থাকে, তখন এ আমানত ঋণরূপে পরিগণিত হয়ে যাবে এবং আমানতদারকে আমানতকারী (জমাকর্তার মালের ক্ষতি হলে) ক্ষতিপূরণ

[56] (আবু দাউদ ৩৫১০নং, নাসাঈ ২/২১৫, ইবনে মাজাহ ২২৪৩নং, হাকেম ২/১৫, আহমদ ৬/৪৯, দারাকুত্বনী ৩১১নং, ইবনে হিব্বান ১১২৫ নং)

[57] (সূরা বাকারাহ ২৪৫ আয়াত)

আদায় করতে হবে। অর্থাৎ আমানতের মাল তার ঘাড়ে ঋণের বোঝাস্বরূপ চেপে যাবে।

এ ক্ষেত্রে এ কথা বিবেচ্য নয় যে, আমানতদার আমানতকারীর অনুমতিক্রমে তার মালে নিজের অধিকার প্রয়োগ করেছে অথবা তার অনুমতি ছাড়াই কোন প্রকার 'তাসার্রুফ' করেছে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যুবাইর (রাঃ) এর লেন-দেন-পদ্ধতি লক্ষণীয়; লোকেরা যখন তাঁর নিকট নিজেদের মাল আমানত রাখতে আসত, তখন তিনি সে মাল আমানত হিসাবে না নিয়ে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতেন। কারণ তিনি এই আশঙ্কা করতেন যে, যদি কোন প্রকারে সে মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমানতের অবস্থায় আমানতকারীরই নোকসান যাবে। পক্ষান্তরে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করলে তাঁকে সে মাল অবশ্যই ফেরৎ দিতে হবে।

তাছাড়া এ কথাও সকলের বিদিত যে, ব্যাংকের সাথে লেনদেনকারীদের যে সম্পর্ক তা হল ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার সম্পর্ক। অর্থাৎ উভয়ের আদানপ্রদান ঋণদাতা ও গ্রহীতার মতই হয়ে থাকে। আর এ কথার সত্যতা ব্যাংকের সেই হিসাব-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যা ব্যাংকের তরফ থেকে তার আমানতকারীদের নামে প্রত্যেক বছর প্রকাশ করা হয়। অথবা ব্যাংক সরকারের নিকট যে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে তাতেও এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

৪- 'মুযারাবাহ' (THE SPECULATION **বা ঝুঁকিবিশিষ্ট অংশীদারী) ও ব্যাংকিং কারবারঃ-**

ব্যাংকের সূদকে হালাল ও জায়েয নিরূপিত করার জন্য একটি বিস্ময়কর তথা অবান্তর কথা এও বলা হয়ে থাকে যে, ব্যাংকের কারবার শরীয়ত-অনুমোদিত মুযারাবাহ[৫৮] (অংশীদারী) ব্যবসায় ও কারবারের মতই! অর্থাৎ ব্যাংক জমাকর্তাদের নিকট থেকে তাদের টাকা 'মুযারাবাহ' হিসাবে গ্রহণ করে। যে টাকার মালিক থাকে জমাকর্তা। অতঃপর ব্যাংক সে টাকার মালিক হয়ে অপরকে তা মুযারাবায় লাগানোর জন্য প্রদান করে। আর এ ক্ষেত্রে যাকে টাকা দেওয়া হয়, সে হয় ব্যাংকের মুযারিব (তার টাকায় ব্যবসাকারী)।

[58] এর ব্যাখ্যা অংশিদারী কারবারে বিভিন্ন প্রকার ভেদ-এর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বাস্তবে এ ধারণা শরীয়ত অনুমোদিত মুযারাবাহ থেকে সম্পূর্ণম ভিন্ন। কেননা মুযারাবাহতে মুযারিব (ব্যবসাকারী) মালের আমানতদার হয়; দেনাদার (ঋণগ্রহীতা) হয় না। আর মাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়ার যমানত কেবল সেই ক্ষেত্রে আসে যখন মুযারিব (আমানতদার ব্যবসায়ী) সে মালে কোন প্রকার খেয়ানত, রক্ষণা-বেক্ষণে ত্রুটি ও অবহেলা অথবা তাতে কোন অসৎ অভিপ্রায় করে বসে। পক্ষান্তরে যখন মুযারাবাহতে মুযারিবের উপর মালের যমানত নেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয় তখন সে মুযারাবাহ শরীয়তসম্মত অবস্থায় থাকে না।

ব্যাংক যে জমাকর্তাদের জমা রাখা টাকার যমানতদার সে কথায় কারো দ্বিমত নেই। তাহলে ব্যাংক একই সাথে অর্থের আমানতদার এবং যমানতদার উভয়ই হওয়া কি প্রকারে সম্ভব? উপরন্তু শরীয়ত অনুমোদিত মুযারাবাহর এক বিধান এই যে, উভয় পক্ষকে লাভ-নোকসানে সমান হারে শরীক হতে হবে এবং কোন পক্ষ অপর পক্ষের হিসাবে নির্দিষ্ট মুনাফা অথবা নির্দিষ্ট মালের নিশ্চিত অধিকারী হতে পারবে না।

সুতরাং টাকার মালিক অথবা মুযারিব (ব্যবসাকারীর) তরফ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত অর্থ যমানত লাভ করা এ প্রকার মুযারাবাহকে বাতিল ও অবৈধ করে ফেলে। আর এ যমানতের শর্তারোপই উক্তপ্রকার কারবারকে হালাল থেকে হারামে পর্যবসিত করে দেয়। কেননা, ইসলামী মুযারাবাহতে এক পক্ষের অর্থ থাকে, আর দ্বিতীয় পক্ষের শ্রম, ব্যয় ও ঝুঁকি নেওয়ার ফলে মাল বৃদ্ধি পায়।

পক্ষান্তরে সূদী (ব্যাংকিং) কারবারে মালের মালিক মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের নিশ্চিত যমানত লাভ করে থাকে; যদিও সে তাতে কোন প্রকার শ্রম ও মেহনত ব্যয় না-ও করে।

রাফে' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلا ، فَكُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ على أن لنا هذه ولهم هذه،
فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ.

অর্থাৎ, 'আমরা আনসারগণের মধ্যে সবচেয়ে অধিক খেতের মালিক ছিলাম। (নিজে চাষ করতে না পারলে) আমরা তা ভাগচাষে অপরকে প্রদান করতাম। আর শর্ত এই হত যে, এই খেতের ফসল আমাদের হবে

এবং এ খেতের ফসল ভাগীদারদের ভাগে হবে। এতে কখনো এক খেতে ফসল হত এবং অন্যটিতে হত না। এ দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ধরনের ভাগচাষ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করলেন।'[59]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, জমির মালিক ও ভাগচাষী উভয় পক্ষকেই জমির কোন একটা দিককে নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ কখনো কখনো এমনও হয় যে, এ নির্দিষ্টীকৃত দিক বা অংশ আপদমুক্ত থেকে ফসল অধিক প্রদান করে, আবার কখনো আপদগ্রস্ত হয়ে যথেষ্ট অথবা কিছুই প্রদান করে না। যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্য হতে কোন এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ এবং অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। আর এই ধরনের একতরফা লাভ ও ক্ষতি ইসলামের ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। ইসলামের ন্যায়-পরায়ণতা; যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন তা হল এই যে, ভাগচাষেও উভয় পক্ষ লাভ-নোকসানে সমানহারে ভাগীদার হবে।

প্রিয় পাঠক! এবারে আপনি ইনসাফের নজরে গভীর চিন্তা করে দেখুন যে, এও কি কোন যুক্তিসম্মত ও বিবেক-গ্রাহ্য কারবার, যাতে উভয় পক্ষের সমান অধিকারের দু'টি মানুষের মধ্যে এক জনের কখনো নোকসান হবে এবং কখনো লাভ, আর অপর জন কেবল লাভে লাভই সঞ্চয় করে যাবে?

এ ধরনের ইনসাফহীন কারবারকে কোন্ শরীয়ত ও কোন্ বিবেক মেনে নিতে পারে? পরন্তু এ কারবারে আশা বর্তমান থাকাও তার বৈধতার কোন প্রকার দলীল হতেই পারে না। কারণ এই শ্রেণীর আশাব্যঞ্জক লাভের সম্ভাবনা তো চাষীর জন্য 'মুখাবারাহ'র ক্ষেত্রেও থাকে। এই আশায় সে এ ভাগচাষ করেও থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি অনুযায়ী মুখাবারাহ অবৈধ।[60]

এর জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সতর্কবাণী রয়েছে; তিনি বলেন,

من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله.

[59] (বুখারী ২৩২৭নং, মুসলিম ৩৯৩০নং, আবু দাউদ ৩৩৯২নং, নাসাঈ ৩৯০৮নং, ইবনে মাজাহ ২৪৫৮নং)

[60] (মুসলিম, আবু দাউদ ৩৪০৭নং)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখাবারাহ ত্যাগ করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা শুনে নিক্![৬১]

উল্লিখিত বর্ণনায় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুখাবারাহকে সূদের একটি শ্রেণী নিরূপিত করে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। আর যেভাবে সূদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ঠিক সেই ভাবেই মুখাবারাহকারীদের বিরুদ্ধেও রয়েছে যুদ্ধের ঘোষণা।

মুখাবারাহ হল এক প্রকার ভাগচাষ। এতে জমির মালিক ভাগচাষীকে এই চুক্তির উপর তার জমি চাষ করতে দেয় যে, চাষী মালিককে এ জমির ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণের ভাগ প্রদান করবে। মনে করুন, আপনার একটি জমি আছে। আপনি সেই জমিটি যায়েদকে এই চুক্তির উপর চাষ করতে সোপর্দ করলেন যে, সে আপনাকে এ জমির ফসলের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ ভাগস্বরূপ প্রদান করবে। যেমন মনে করুন, প্রত্যেক ফসলের সময় আপনাকে ৫ মন দিতে বাধ্য থাকবে; তাতে সে জমির উৎপন্ন ফসল অধিক হোক অথবা মোটেই না হোক।

অথবা মনে করুন যে, যতটা ফসল পানির নালার ধারে-পাশে উৎপন্ন হবে, তা সে আপনাকে দেবে এবং বাকী সে (চাষী) নেবে। এ ধরনের ভাগচাষকে 'মুখাবারাহ' বলা হয়।

এবারে যদি আপনি ব্যাংকের কারবার নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করে দেখেন, তাহলে এ কথা বুঝতে পারবেন যে, তা হুবহু মুখাবারাহ ভাগচাষের মতই কারবার; যা হারাম ও অবৈধ।

৫- রিবাল ফায্ল (একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের হাতে-হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাড়তি অংশ) ও ব্যাংকের সূদঃ-

ব্যাংকের সূদকে হালাল ও জায়েয করার জন্য একটি যুক্তি এও পেশ করা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা যখন সূদকে হারাম করেন, তখন প্রচলিত ছিল সোনা-চাঁদির মুদ্রা। অতএব সেই মুদ্রাতেই সূদ হারাম এবং অধুনা প্রচলিত কাগজের নোটে সূদ হারাম নয়। কেননা সূদ বিষয়ে যে

[61](আবু দাউদ ৩৪০৬নং, হাকেম ২/২৮৬ আর তিনি বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ) আল্লামা আলবানীর নিকট হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন, যয়ীফ আবু দাউদ ৭৩৯নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৯৯৩নং, যয়ীফ জামেউস সগীর ৫৮৪১নং) -অনুবাদক।

সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর তা হল খেজুর, গম, যব, লবণ, সোনা ও চাঁদি (খাদহীন স্বচ্ছ রৌপ্য)। এগুলোর মধ্যে সোনা ও চাঁদিতে সূদ পাওয়া যায়---আর এর যুক্তিও নিতান্ত স্পষ্ট। কারণ, উভয় বস্তুই হল মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট পদার্থ। যার নিজস্ব মূল্যমান আছে যদিও বা তা মুদ্রা ও টাকা-পয়সার মত ব্যবহার না করা হয়।

আরো অবাক হওয়ার কথা এই যে, অনেকে বলেছে, এই কাগজের নোটের মূল্যমান তার ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুন কমে যায়। আর এ রকম হয় মুদ্রাস্ফীতির সময়। অর্থাৎ টাকার মালিক ব্যাংক থেকে যে সূদ গ্রহণ করে, তা সে এ ঘাটতির বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে যা মুদ্রাস্ফীতির কারণে তার অর্থে আপতিত হয়। বরং কখনো কখনো ব্যাংকের এই সূদ মুদ্রাস্ফীতিজনিত এ ঘাটতি অপেক্ষাও কম পরিমাণের হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্যাংক ১০% সূদ দেয়, আর মুদ্রাস্ফীতির হার ১৫%। তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বাস্তবপক্ষে ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা ৫% ক্ষতি ও নোকসানের শিকার হয়।

তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, কেবলমাত্র সোনা-চাঁদির টাকাতেই যাকাত ফরয এবং সোনা-চাঁদীর মুদ্রাতেই সূদ জারী হয়, তাহলে তার মতলব এই দাঁড়ায় যে, কাগজের নোটে যাকাত নেই; যা ইসলামের তৃতীয় রুক্ন এবং কাগজের নোট বিনিময় করার ক্ষেত্রে সূদ নেওয়া-দেওয়া হালাল; অথচ তা শুধু হারামই নয় বরং সাতটি বিধ্বংসকারী বিষয়াবলীর অন্যতম।[৬২]

পরন্তু যুক্তিবাদীদের উক্ত যুক্তি মূলেই বাতিল। কেননা, বর্তমানে কাগজের নোটের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় ও পণ্য বিনিময় হয়ে থাকে; বিবাহে মোহর দেওয়া হয়, এবং ভাড়া ও মজুরী আদায় করা হয় (যেমন সে কালে সোনাচাঁদির মুদ্রার মাধ্যমেই অনুরূপ আদান-প্রদান হত)। মোট কথা, এই নোটের উপরেই যাবতীয় শরয়ী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। আর এই নোট যার কাছে যত বেশী থাকে, সে তত বড় ধনবান বলে সমাজে পরিচিত।

[62] (দেখুন, বুখারী ২৭৬৬নং, মুসলিম ৮৯নং)

বাকী থাকল মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুদ্রামান তথা ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস ও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা; যা বাস্তব ও সত্য হলেও এ ক্ষেত্রে হক বলে বাতিল উদ্দেশ্য ও অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৮ সনে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামী কন্‌ফারেন্সের ইসলামী ফিক্‌হ আলোচনা সভায় উক্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এই আলোচনাচক্রে উলামাগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান; এক দলের মতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে মুদ্রামান কমে যাওয়া বিবেচ্য বিষয় নয়।

অতএব যদি নোট অবশিষ্ট এবং ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত থাকে, তাহলে সেই নোটই (ঋণে) ফেরৎ যোগ্য। অর্থাৎ যদি ডলার দিয়ে থাকে, তবে ডলারই ফেরৎ পাবে। টাকা নিয়ে থাকলে টাকাই ফেরৎ দিতে হবে; যদিও তার মুল্যমান এক শ'তে এক হাজার কমে যায়। উলামাদের এই দল কাগজের নোটকে প্রত্যেক বিষয়ে সে কালের সোনা-চাঁদির মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত ও বিকল্প মনে করেন।

এঁদের দ্বিতীয় দল কাগজের নোটকে মৌলিকভাবে সোনা-চাঁদির মুদ্রার মান দান করেন। কিন্তু সাধারণভাবে তার স্থলাভিষিক্ত মনে করেন না। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নোটকে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার বিকল্প মনে করেন; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা মনে করেন না।

পক্ষান্তরে মুদ্রাস্ফীতিজনিত নোটের মূল্যমান কমা-বাড়া বিবেচ্য হলে তা সকল প্রকার লেনদেনেই হওয়া উচিত। সুতরাং আইন এই করে দেওয়া উচিত যে, ঋণগ্রহীতাকে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হার অনুপাতে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে; আর সেই হার অনুসারে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না, যে হার পাঁচ বছর পূর্বে ঋণ নেওয়ার সময় ছিল। কিন্তু এসব লেনদেনের ক্ষেত্রে লোকেরা মুদ্রাস্ফীতির কথা ভুলে থাকবে আর শুধুমাত্র ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে তা স্মরণে ও খেয়ালে রাখবে-- এমন কথা কি আশ্চর্যজনক নয়? সুতরাং আরোপিত সূদ অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতির হার বেশী হলে ব্যাংকের নিকটেও এ মুদ্রাস্ফীতিজনিত ঘাটতি পূরণ দাবী করা উচিত। কিন্তু তা কেউ করে কি?

এবারে আপনি ভেবে দেখুন যে, লোকেরা যখন ব্যাংকে টাকা জমা করবে অথবা অন্য কাউকে ঋণ দেবে, তখন মুদ্রাস্ফীতির কথা ও হিসাব মনে মনে রাখবে, অথচ যখন সে নিজে নেবে তখন ঋণগ্রহীতার ব্যাপারে

তা ভুলে বসবে এটা কি ভুল ও অসৎ বাহানা নয়; যা সূদকে হালাল করার জন্য অবলম্বন করা হয়েছে?

বস্তুতঃ এ সমস্যা হল একটি মৌলিক সমস্যা। আর ব্যাংকের মৌলিক কারবার হল সূদী কারবার। অতএব যে কোন নোট, কারেন্সী, সোনা, চাঁদি অথবা অন্য কোন মালে যে অতিরিক্ত অংশ দেওয়া-নেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়, তা যে কোন অবস্থা ও যে কোন ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে সূদ বলেই গণ্য। এই জন্য এ ধরনের কৌশল বা বাহানার মাধ্যমে সূদ হালাল হতে পারে না; কারণ সত্য ও হক সূর্যবৎ স্পষ্ট।

অর্থ ও মুদ্রার মাঝে পার্থক্য ঃ

এখানে অর্থ ও মুদ্রার মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করে দেওয়া আশা করি পাঠকের জন্য উপকারী হবে। অর্থ হল সেই জিনিস যার মাধ্যমে বিনিময় কর্ম, পরিমাণ-নির্ধারণ ও আর্থিকতার সংরক্ষণ হয়ে থাকে; কিন্তু একে আইনতঃ বাধ্যতামূলক বিনিময়-মাধ্যমরূপে চুড়ান্ত স্থিরীকৃত করা জরুরী নয়। যেমন চেক, প্রাইজ-বন্ড্ প্রভৃতি দস্তাবেজ ও প্রতিশ্রুতিপত্র দ্বারা লোকেরা পণ্য বিনিময় করে থাকে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তার প্রাইজ-বন্ড্ দ্বারা কোন মূল্য আদায় করতে চায় এবং প্রাপক তার প্রাপ্য অধিকার এ বন্ডের মাধ্যমে নিতে রাজী না হয়, তাহলে তাকে তা নেওয়ার জন্য আইনতঃ বাধ্য করা যেতে পারে না।

পক্ষান্তরে কারেন্সী বা মুদ্রা সেই অর্থের নাম, যাকে আইনগতভাবে অন্তর্দেশীয় বিনিময়-মাধ্যমরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ডলার, টাকা প্রভৃতি কারেন্সীনোট। যদি কেউ টাকার মাধ্যমে কোন কিছুর মূল্য আদায় করে, তবে প্রাপককে তা নিতে আইনতঃ বাধ্য করা যাবে।

৬- চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ ও ব্যাংকের সূদঃ-

ব্যাংকের সূদকে বৈধ ও হালাল করার মানসে একটি সন্দিগ্ধ যুক্তি এও পেশ করা হয়ে থাকে যে, যে সূদকে কুরআন হারাম ঘোষণা করেছে তা হল কেবলমাত্র চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ। অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক পরিমাণের সূদ অথবা ক্রমবর্ধমান সূদের সূদ; যে সূদে সূদখোর অভাবী মানুষের অভাবকে সুযোগরূপে ব্যবহার করে তাকে শোষণ করে ছাড়ে। পক্ষান্তরে স্বল্প

পরিমাণের সূদ; যেমন ৮% বা ১০% সূদে শোষণ পাওয়া যায় না। অতএব এমন স্বল্পাকারের সূদ কুরআনে ঘোষিত অবৈধতার পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৩০ আয়াতে বলেন,

{﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ ভক্ষণ করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

যাঁরা আরবী ভাষার বিভিন্ন পরিভাষা ও বাক্‌ধারা সম্পর্কে অবহিত এবং কুরআন মাজীদের বাগ্‌বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারা সম্বন্ধে অবগত তাঁরা সকলেই জানেন যে, সূদের উক্ত (চক্রবৃদ্ধিহারে) বিশেষণ তার নিকৃষ্টতার যথারীতি প্রচার ও প্রসিদ্ধি তথা বাস্তব প্রেক্ষাপট তুলে ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ উক্ত বিশেষণ সূদ হারামের জন্য কোন শর্ত নয়। অর্থাৎ সাধারণ সূদ হারাম হওয়ার ব্যাপারটা উক্ত গুণসাপেক্ষ নয়। কেননা, জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা ব্যাপকভাবে ক্রমবর্ধমানহারে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ সূদের সূদ নিয়ে যে চরম সীমায় পৌঁছেছিল তাকেই 'চক্রবৃদ্ধিহার' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ ধরনের বাস্তবসূচক বিশেষণ উক্ত অবৈধতায় শর্ত হিসাবে বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ তার অর্থ এই নয় যে, সূদ চক্রবৃদ্ধিহারে না হলে তা গ্রহণ করা বৈধ। তাছাড়া ঃ

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের অধিকারভুক্ত।[৬৩]

এই আয়াত হতে স্পষ্টাকারে এ কথাই বুঝা যায় যে, মূলধন ছাড়া অন্য কিছু ঋণদাতাদের অধিকারভুক্ত নয়, সুতরাং তা থেকে এক পয়সাও বেশী নেওয়া হারাম হবে।

এতদ্ব্যতীত কম ও বেশী নির্ধারণ করার কষ্টিপাথর কি? সেটা এমন কোন্ নিক্তি যে ১০%কে কম এবং ১২%কে বেশী বলে নিরূপণ করবে?

[63] (সূরা বাক্বারাহ ২৭৯)

আমরা যদি কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করি তাহলে দেখা যাবে, চক্রবৃদ্ধিহারে বলতে ৬০০% হচ্ছে। কেননা, উক্ত আয়াতে 'আযআফ' শব্দটি বহুবচন। আর বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল তিন। এবারে ওকে দ্বিগুণ করলে ৬ হবে। অর্থাৎ ১০০ টাকায় ৬০০ টাকা সূদ হবে। তাহলে কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কি এ কথা বলতে পারে যে, সূদের এই বিরাট অংক অর্থাৎ ৬০০% হারে সূদ খাওয়াকেই আল্লাহ হারাম করেছেন এবং এর চেয়ে কম অংকের অর্থাৎ ৩০০% অথবা ৪০০% হারে সূদ খাওয়াকে জায়েয করেছেন?!

৭- ব্যাংকের ইন্টারেষ্ট ও জাহেলিয়াতের সূদ ঃ-

ব্যাংকের সূদ হালাল করার লক্ষ্যে আরো একটি খোঁড়া যুক্তি এই বলে পেশ করা হয় যে, ব্যাংকের সূদ সেই জাহেলিয়াতের সূদ থেকে ভিন্নতর যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে হারাম করেছেন এবং সেরূপ সূদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। কারণ, কতিপয় সলফদের উক্তিমতে জাহেলিয়াতের সূদ এরূপ ছিল যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কর্জ দিত। অতঃপর সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে বলত, 'আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও, নচেৎ এর উপর সূদ দাও।' অবশ্য জাহেলিয়াতের সূদ যে এরূপ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যুগে কেবলমাত্র এই এক রকমই সূদ যে প্রচলিত ছিল না---তাও সত্য।

কেননা, বহুসংখ্যক দলীল ও ঘটনা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, ঋণ-চুক্তির প্রারম্ভেই সূদ নেওয়ার শর্ত আরোপ করা হত; যেমন, বাণিজ্যিক কাফেলার লোকেরা এরূপ করত। আল্লামাহ আবু বক্‌র জাস্‌সাস (রঃ) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' নামক তফসীরগ্রন্থে লিখেছেন যে, যে ধরনের সূদ সে যুগের আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যে ধরনের সূদ ছাড়া তারা অন্য সূদ জান্‌ত না---তা এই যে, জাহেলিয়াতের লোকেরা একে অন্যের নিকট ঋণ করার সময় আপোসে মূলধন ছাড়া এত টাকা বাড়তি আদায় করতে হবে---এই চুক্তি নিষ্পন্ন করে নিত।

প্রায় অনুরূপ কথাই ইমাম ত্বাবারী এবং আল্লামা রাযীও তাঁদের তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

পরন্তু তর্কের খাতিরে যদি এ কথাও মেনে নেওয়া যায় যে, জাহেলিয়াতের সূদ যুক্তিতে উপস্থিত সূদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; অর্থাৎ জাহেলিয়াতের সূদ ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত প্রথম মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই শুরু হত, তাহলে দ্বিতীয় প্রকার সূদ অর্থাৎ চুক্তির গোড়াতেই শর্তারোপিত সূদ অধিকতর হারাম হওয়া উচিত। কারণ উপরোক্ত কথাগুলির সারমর্ম এই যে, জাহেলিয়াতের যুগে ঋণ দেওয়ার শুরুতে বিনা সূদে ঋণ দেওয়া হত এবং সূদ নেওয়া ঠিক তখন থেকে শুরু হত, যখন ঋণ পরিশোধ করার নির্ধারিত মেয়াদ পার হয়ে যেত এবং ঋণগ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধ করতে পারত না।

যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শুরুতেই ঋণের উপর আরোপিত শর্ত অনুযায়ী সূদ খাওয়া অধিকরূপে হারাম ও নাজায়েয। আর ব্যাংক এই দ্বিতীয় প্রকার কারবারই করে থাকে। কেননা, ব্যাংকে ঋণগ্রহীতার উপর সূদের হিসাব প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়ে যায়। পরন্তু জাহেলিয়াতের প্রথম প্রকার সূদও ব্যাংকের বর্তমান লেনদেনে পাওয়া যায়। কারণ ঋণ শোধ করার নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এবং ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের ঋণ আদায় করতে না পারলে তাকেও বলা হয় যে, 'হয় তোমার ঋণ পরিশোধ কর, না হয় আরো সূদ আদায় কর।' এ ছাড়া যদি পরিশোধে একটা মাত্র দিন বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সেই দিনের সূদও তার উপর জুড়ে দেওয়া হয়। এবং এইভাবে যতদিন বিলম্ব হয়, তত দিনের সূদ তার ঘাড়ে হিসাবমত চাপিয়ে দেওয়া হয়।

৮- জমি ভাড়া দেওয়ার উপর সূদের কিয়াস ঃ-

একটি যুক্তি এও পেশ করা হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে এবং তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে সূদ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতই যে তার জমি অপরকে ঠিকা দেয় এবং তার নিকট থেকে চুক্তিমত নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাড়া গ্রহণ করে। সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার জমিতে ফসল হল, কি না হল তার খেয়াল ও পরোয়াই করে না। বরং সে শুধুমাত্র তার জমি চাষ করতে দিয়েই তার ভাড়ার অধিকারী হয়ে যায়।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, উক্ত যুক্তিতে বিভ্রান্তিকর হেত্বাভাস ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটিকে যদি আমরা ফিক্হী ভাষায় বলি, তাহলে বলতে পারি যে, এ যুক্তিতে জমির উপর টাকাকে এবং ভাড়ার উপর সূদকে কিয়াস করা হয়েছে। অথচ এমন কিয়াস মুলেই অচল। কেননা, কিয়াস সহীহ ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য (অনুমেয় ও অনুমিত উভয়ের) ইল্লত বা হেতু অভিন্ন হওয়া আবশ্যিক। আর এখানে সেই হেতু অভিন্ন নয়। জমি ঠিকার উপর দেওয়ার ইল্লত (হেতু) হল, জমির সত্ত্ব ব্যবহার করে লাভবান হওয়া যায়। পক্ষান্তরে টাকা যতক্ষণ টাকা থাকে, ততক্ষণ তার সত্ত্ব দ্বারা লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। কারণ টাকার সত্ত্ব কারোরই ঈপ্সিত নয়। (ঈপ্সিত হল তার বিনিময়।) ইমাম গায্যালী (রঃ) তাই বলেছেন। (ইহ্য়াউল উলূম ৪/৮৮) অনুরূপভাবে টাকা পয়সার মান জমি থেকে ভিন্নতর। আর এই ভিন্নতা থাকার কারণেই উক্ত কিয়াস (অনুমিতি) শুদ্ধ নয়।

পক্ষান্তরে জমি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা ইজারার পর্যায়ভুক্ত যা যুক্তি ও হিকমতপূর্ণ ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। ইজারাতে মূল সত্ত্ব ভাড়া দেওয়া হয় এবং তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার দরুন ব্যবহারকারীর নিকট থেকে কিছু ভাড়া নেওয়া হয়। পরন্তু তার মূল সত্ত্ব বিনষ্ট হয়ে যায় না। আর টাকা-পয়সা ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটা হল ইহসান ও পরহিতৈষিতার পর্যায়ভুক্ত। আর এই জন্যই এর উপর মজুরী বা ভাড়া নেওয়া অবৈধ।

সুতরাং এর মধ্যে এবং জমি ভাড়া দেওয়ার মধ্যে রয়েছে বড় পার্থক্য। এই পার্থক্যটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুনঃ- মনে করুন, এক ব্যক্তি তার জমি অপর ব্যক্তিকে বার্ষিক ৫০০ টাকা হিসাবে ঠিকায় দিল। উক্ত ৫০০ টাকা হল এ জমির মূল সত্ত্ব দ্বারা উপকৃত হওয়ার ভাড়া। পরন্তু সারা বছর চাষ করার ফলেও জমির সত্ত্ব বিনষ্ট হয় না।

ধরে নেওয়া যাক, বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ষষ্ঠ মাসে এ জমিটি নদীর ধসে নষ্ট হয়ে গেল। এমতাবস্থায় জমির মালিক ২৫০ টাকা ঠিকাদারকে অবশ্যই ফেরৎ দেবে। কেননা, জমির সেই মূল সত্ত্ব যার দ্বারা ঠিকাদার লাভবান হয়ে আসছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব সে ভাড়া কেন আদায় করবে? পক্ষান্তরে ঋণের প্রসঙ্গটা ঠিক এর বিপরীত। ধরে নিন, ঋণের নেওয়া টাকা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে হারিয়ে গেল অথবা পুড়ে গেল।

এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকট থেকে এই দাবী করতে পারে না যে, তোমার টাকা যেহেতু নষ্ট হয়ে গেছে, সেহেতু তুমি আমাকে পুনর্বার ঋণ দাও। বরং এই ক্ষতি ঋণগ্রহীতাকেই বহন করতে হবে।

বুঝা গেল যে, জমি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারের উপর ঋণ দেওয়ার ব্যাপারকে কিয়াস করা এবং এই কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা ব্যাংকের সূদকে হালাল করা আদতেই সঠিক নয়।

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, ব্যাংকের সূদ হালালকারিগণ বিভিন্ন দুর্বল ও ভিত্তিহীন দলীল প্রয়োগ করে সরলমনা মুসলমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছেন।

৯- 'বাইএ সালাম' এর উপর সূদকে কিয়াস ঃ-

সূদকে জায়েয করার মানসে একটি যুক্তি এও পেশ করা হয় যে, ঋণ দিয়ে সূদ নেওয়ার কারবারটা ঠিক 'বাইএ সালাম' (THE PREPAYMENT) দাদন ব্যবসা বা পূর্বে মূল্য আদায় করে পরে পণ্য নেবার চুক্তি-ব্যবসা) এর মত।

কারণ এ কারবারে উভয় পক্ষের লাভ বর্তমান। আর তা এইভাবে যে, ঋণগ্রহীতা সূদের উপর অর্থ সংগ্রহ করে; যাতে সে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। ওদিকে ঋণদাতা নিজের মূলধন অপেক্ষা বেশী টাকা গ্রহণ করে থাকে, আর তা হল সেই বিলম্ব দেওয়ার বিনিময়ে যা সে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ-পরিশোধে দিয়ে থাকে। আর এরূপই হয়ে থাকে বাইএ সালামে।

কারণ, বাইএ সালামে তুলনামূলক কম মূল্য অগ্রিম আদায় করা হয়ে থাকে। যাতে পরে সেই আগাম কেনা ফসল দ্বারা অধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। আর এ ধরনের অগ্রিম চুক্তি ব্যবসাকে ইসলাম বৈধ নিরূপণ করেছে। এই ব্যবসার উপরেই সূদভিত্তিক কারবারকে কিয়াস করে ব্যাংকের সূদকে হালাল বলা হচ্ছে। কারণ উভয় প্রকার কারবারেই এই ধরনের লেনদেন ও অর্থ বিদ্যমান।

উক্ত যুক্তিপেশকারীদের যুক্তির জবাব এই যে, 'বাইএ সালাম' ও সূদভিত্তিক ঋণের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিধায় একেক অপরের

উপর কিয়াস (অনুমিতি) করা আদৌ সঠিক নয়। উভয় কারবারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিম্নরূপঃ-

ক- 'সালাম' (THE PREPAYMENT) দাদন ব্যবসা বা পূর্বে মূল্য আদায় করে পরে পণ্য নেবার চুক্তি ব্যবসা) এক প্রকার ব্যবসা; যাতে মূল্য ও পণ্য উভয় পাওয়া যায়। এতে কেবল টাকা-পয়সারই কারবার হয় না। অর্থাৎ, টাকার পরিবর্তে টাকার বিনিময় হয় না। পক্ষান্তরে সূদভিত্তিক ঋণের (ব্যাংকের) কারবারে নগদ অর্থই সবকিছু। বরং নগদ অর্থই এর আসল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ টাকার পরিবর্তে টাকার বিনিময় হয়; যা হাদীসের ভাষায় 'রিবাল ফায্ল'।

খ- 'সালাম' ব্যবস্যয় ক্রেতা প্রত্যেক বারেই লাভবান হতে পারে না। কেননা, অধিকাংশ দেখা যায় যে, ক্রীতপণ্য নেবার সময় তার মূল্য পড়ে গেছে। আবার কখনো বেড়েও থাকে। সুতরাং 'সালাম' ব্যবসায় লাভের গ্যারান্টি থাকে না। তাছাড়া সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সব আপদ-বিপদ ও লাভ-লোকসান সামনে আসে, তাও তাতে বিদ্যমান। কিন্তু সূদভিত্তিক ঋণের ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। এতে পূর্ব থেকেই লাভ ও মুনাফার গ্যারান্টি থাকে এবং কোন প্রকারের আপদ-বিপদ অথবা ঝুঁকির আশঙ্কা থাকে না।

গ- 'সালাম' ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম প্রভৃতি আরো কল্যাণমূলক কর্মে এক ধরনের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দান করা হয় এবং তা জীবন-তরীকে উন্নয়ন-পথে অগ্রসর করতে ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রগতিশীল করতে বড় সহায়ক। পক্ষান্তরে সূদভিত্তিক ঋণের কারবারে এ কথা পাওয়া যায় না। উল্টা এতে বাজার-মন্দা সৃষ্টি হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কর্মের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং এর ফলেই বাণিজ্যিক উদ্যম শীতল হয়ে নিশ্চল অবস্থায় পর্যবসিত হয়। (বিনা পরিশ্রমে টাকা এলে কে যাবে আর পরিশ্রম করতে?)

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনায় একথাই প্রমাণিত হল যে, উক্ত যুক্তি উপস্থাপিত করেও সূদ হালালকারিগণ সরলমনা মানুষদের চোখে ধুলো দিচ্ছেন এবং তাদেরকে নোংরা, গর্হিত ও অসৎকর্মের দিকে দেদার আহ্বান করে যাচ্ছেন।

১০- কতিপয় হাদীস দ্বারা সূদকে হালাল প্রতিপাদন ঃ-

ব্যাংকের সূদকে হালাল করার জন্য আরো একটি যুক্তি এই পেশ করা হয়ে থাকে যে, ব্যাংক অপরের পুঁজি দ্বারা তার বিনা অনুমতিতে ব্যবসা করে, আর ব্যবসায় লাভের অর্থ আল্লাহ হালাল করেছেন। এই জন্য ব্যাংক এবং তাতে টাকা জমাকর্তা উভয়ের জন্য উক্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করা হালাল, এই যুক্তির দলীলে উরওয়াহ বিন আবিল জা'দ (রাঃ) এবং হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস পেশ করা হয়। যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ উরওয়াহ (রাঃ)কে একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল খরীদ করতে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেন। তিনি এ দীনার দ্বারা দুটি ছাগল খরীদ করলেন। অতঃপর একটিকে এক দীনারে বিক্রয় করে সেই দীনার সহ এ ছাগল নবী ﷺকে সমর্পণ করলে তিনি তাঁর ব্যবসায় বর্কতের দুআ দিলেন।[৬৪]

অনুরূপ তিনি হাকীম বিন হিযাম রাঃ কে একটি দীনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করতে বলেছিলেন। তিনি দীনারটি দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করে পুনরায় তা দুই দীনারে বিক্রয় করে দেন। অতঃপর একটি দীনার দ্বারা আবার একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করে দীনার সহ পশু নবী ﷺকে প্রদান করেন। তিনি দীনারটিকে সদকাহ করেছিলেন এবং হাকীমের ব্যবসায় বর্কতের দুআ দিয়েছিলেন।[৬৫]

উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা ব্যাংকের সূদকে এভাবে হালাল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে যে, উভয় সাহাবীই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেওয়া দীনার দ্বারা তাঁর বিনা অনুমতিতে ব্যবসা করলেন এবং লাভকৃত দীনার সহ ছাগল বা (কুরবানীর পশু) ভেঁড়া নবী ﷺকে সমর্পণ করলেন। অনুরূপ ব্যাংকও জমাকর্তার বিনা অনুমতিতে তার টাকা নিয়ে ব্যবসা করে এবং তার লভ্যাংশ তাকে প্রদান করে।

এই যুক্তির তৃতীয় দলীল গুহাবন্দীদের হাদীস। যাতে বলা হয়েছে যে, তিন ব্যক্তি একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিলে একটি বিরাট পাথর গুহার

64 (বুখারী ৩৬৪২ নং, আবু দাঊদ ৩৩৮৪নং)

65 (আবু দাঊদ ৩৩৮৬নং, তিরমিযী ১২৮০নং, হাদীসটি যয়ীফ, দেখুন মিশকাতের টীকা, হাদীস নং ২৯৩৭নং, যয়ীফ আবু দাঊদ ৭৩৩নং, আউনুল মা'বুদ ৯/২৩৮-২৪৩)

মুখে পড়ে গেলে তারা সেখানে বন্দী হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ নেক আমলের অসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করে; যাতে পাথর সরে গিয়ে তারা সেখান থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। ওদের মধ্যে একজন তার একটি নেক আমল উল্লেখ করে এভাবে দুআ করতে লাগল, 'হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে (সাড়ে সাত কিলো) চালের বিনিময়ে একটি মজুর রেখেছিলাম। মজুরী পেশ করলেও সে তা না নিয়ে আমার নিকটেই ছেড়ে চলে যায়। অতঃপর আমি তার মজুরীর চালকে (ব্যবসায় খাটিয়ে) বাড়াতে লাগলাম। অবশেষে সেই চালের টাকা দিয়েই একপাল গাই এবং একটি রাখাল কিনে নিলাম। কিছু দিন পর সেই মজুর তার মজুরী নিতে আমার নিকট এল। আমি রাখাল সহ সমস্ত গাই তাকে দিয়ে দিলাম-- ।'[৬৬]

উপর্যুক্ত তিনটি হাদীস থেকে নিম্নলিখিত মাসআলা প্রতিপন্ন করা হয়েছেঃ-

ক- অপরের পুঁজি দ্বারা তার বিনা অনুমতিতে ব্যবসাকারী যে লাভ অর্জন করে, তার সবটাই পুঁজিপতিকে দিতে পারে।

খ- সম্পূর্ণ লাভটাই সে নিজে রেখে নিতে পারে।

গ- এ লাভের কিয়দাংশ পুঁজিপতিকে দিয়ে বাকী অংশ নিজের জন্য রাখতে পারে।

ব্যাংকের কারবার এই তৃতীয় প্রকার মাসআলার পর্যায়ভুক্ত। অতএব ব্যাংকের সূদ সূদ নয়; প্রকৃতপক্ষে তা হল ব্যবসার লভ্যাংশ। আর তা নিঃসন্দেহে হালাল।

কিন্তু পূর্বোল্লেখিত তিনটি হাদীসকে নিয়ে যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, এখানে যে কিয়াস করা হয়েছে তা যথার্থ নয়।

নবী ﷺ যে উরওয়াহ (রাঃ)কে একটি দীনার দিয়ে ছাগল অথবা কুরবানীর পশু (ভেঁড়া) ক্রয় করতে বলেছিলেন সে ব্যাপারটি প্রতিনিধিত্বের; 'মুযারাবাহ' (পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করতে দেওয়ার) ব্যাপার নয়। প্রতিনিধি করার অর্থ হল এই যে, 'তুমি অমুক কাজে আমার স্থলাভিষিক্ত হও। (বা আমার হয়ে তুমি অমুক কাজ করে দাও।)' আর

66 (হাদীসটি প্রসিদ্ধ, দেখুন, বুখারী ২৩৩৩নং)

উকীল বা প্রতিনিধিকে যে কাজে উকালতি বা প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়, সে কাজে তার নিজস্ব এখতিয়ার চালনোর অনুমতি থাকে। তাছাড়া সাধারণ অনুমতি থাকলে তো কোন সমস্যায় নেই। কিন্তু যদি সাধারণ অনুমতি না হয়, তাহলে সে কাজে উকিলের নিজস্ব এখতিয়ার তার মুয়াক্কিলের অনুমতি সাপেক্ষ থাকে; মুয়াক্কিল রাজি হলে উকিলের এখতিয়ার সঠিক ও জায়েয, নচেৎ জায়েয নয়। উপর্যুক্ত দুটি হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ ছাগল ও কুরবানীর পশু ক্রয় করার জন্য উল্লিখিত দুই সাহাবীকে নিজের প্রতিনিধি বা উকিল বানিয়েছিলেন। এবারে উরওয়াহ বিন আবিল জা'দ বারেকী (রাঃ) এক দীনারে দুটি ছাগল পেয়ে গিয়েছিলেন, আর এ জন্যই তিনি অতিরিক্ত একটি ছাগল এক দীনারে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।

হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) কুরবানীর এক মেষ ক্রয় করেছিলেন। অতঃপর তা পছন্দ না হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে দুই দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। তারপর এক দীনারে একটি মেষ ক্রয় করে বাড়তি দীনারসহ তা নবী ﷺ কে সোপর্দ করেছিলেন।

এবারে একটু চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে যে, উভয় সাহাবী নবী ﷺ এর অনুমতি ও সন্তোষ বাইরে কিছুই করেননি। আর এ কথা কল্পনাই বা কি করে করা যেতে পারে যে, সাহাবীদ্বয় নবী ﷺ এর অনুমতি ছাড়াই সে কাজে নিজেদের ইচ্ছা প্রয়োগ করেছেন? বলা বাহুল্য, তাঁর অনুমতি ও সন্তোষ শুরুতেও ছিল এবং শেষেও। এ কথার স্পষ্ট দলীল এই যে, তিনি তাঁদের এ কাজ পছন্দ করলেন এবং উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কতের দুআও দিলেন।

অতএব উভয় সাহাবী রসূল ﷺ এর বিনা অনুমতিতেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় করেছিলেন এ কথা বাস্তব থেকে বহু ক্রোশ দূরে। আর তা যে হাদীসকে সঠিক ও যথার্থভাবে বুঝতে অক্ষমতার পরিণতি---তা বলাই বাহুল্য। পরন্তু এই ভুল বুঝার ভিত্তিতেই সমস্ত হাদীসকে সূদ হালালের দলীলরূপে পেশ করা হয়েছে। অথচ যে ব্যাখ্যা ও বুঝের ভিত্তিতে এমনটি করা হয়েছে, তা কোন হাদীস ব্যাখ্যাতাই করে যাননি।[৬৭]

---

[67] (দেখুন, ফাতহুল বারী ৪/৪৭৭-৪৭৮, ৫/২১, ৬/৭৩৩-৭৩৪, তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৪৬৯-৪৭২, আউনুল মা'বুদ ৯/২৩৮-২৪৩, সুবুলুস সালাম ৩/৫৫, নাইলুল আওতার ৫/২৭০-২৭১, মিরকাতুল মাফাতীহ ৩/৩৩৪)

জনৈক পারসী কবি কি সত্যই না বলেছেন,

খিশ্‌তে আওয়াল চুঁ নেহদ মে'মার কজ্,
তা সুরাইয়্যা মী রসদ দীওয়ার কজ্।

অর্থাৎ, রাজমিস্ত্রি যখন প্রথম ইটটাই টেরা করে গাঁথে, তখন আকাশ পর্যন্ত দেওয়াল টেরা হয়েই উঠে।

পক্ষান্তরে নিজের পুঁজি দিয়ে অপরকে ব্যবসা করতে দেওয়ার অর্থ হল, 'তুমি আমার টাকা দ্বারা ব্যবসা কর। ব্যবসার লাভ আমরা উভয়ে ভাগাভাগি করে নেব।' যেমন প্রতিনিধিত্বে লাভ বা নোকসান ভাগাভাগির কোন প্রশ্নই নেই। তবে হ্যাঁ, প্রতিনিধি তার পারিশ্রমিক নিতে পারে। এখানে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারকে 'মুযারাবাহ' (পুঁজি দিয়ে অপরকে ব্যবসা করতে দেওয়া) এর উপর কিয়াস (অনুমিতি) করা হয়েছে, যা যথার্থ ও সঠিক নয়।

ব্যাংক ডিপোজিটারদের পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে (যদি সঠিক অর্থে ও বাস্তবে সে ব্যবসাই করে। নচেৎ ব্যাংক স্বয়ং নিজে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা করে না। বরং সে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতিকে সুদের উপর ঋণ সরবরাহ করে থাকে), তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না। আবার শরীয়ত যে ধরনের মুযারাবাহকে বৈধ নিরূপিত করেছে, তার শর্তাবলী ব্যাংকের কারবারে পাওয়া যায় না।

যেমন; মুযারাবাহ উভয় পক্ষ (টাকার মালিক ও ব্যবসায়ী) প্রত্যেক লাভ-নোকসানে সমানহারে শরীক হয়। কিন্তু ব্যাংকে টাকা জমাকর্তা কেবল লাভেই শরীক হয়, নোকসানে হয় না। যাতে মুযারাবাহর শরয়ীরূপ বাতিলে পরিণত হয় এবং লাভের টাকাও সূদ রূপে পরিগণিত হয়ে যায়।

গুহাবন্দীদের হাদীসটিকে আরো একবার মনোযোগ সহকারে পড়লে বুঝতে পারবেন যে, সে ব্যক্তি মজুরের মজুরীর টাকা নিয়ে এ ব্যবসা করেনি। বরং উক্ত ব্যবসা সে নিজের মালিকানাধীন অর্থের মাধ্যমেই করেছিল। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরকে তার মজুরী দিয়ে দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মজুরী মজুরের মালিকানাভুক্ত হয় না। কেননা, ধরে নেওয়া যাক, যদি এ চাল মালিকের নিকট হতে চুরি হয়ে যেত বা পুড়ে যেত অথবা কোন প্রকারে নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে নোকসান কার হত? মালিকের না মজুরের? আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, নোকসান মালিকেরই হত।

এবারে কি মালিকের এ কথা বলার অধিকার ছিল যে, তোমার চাল নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব তুমি আর মজুরী পেতে পার না? নিশ্চয় এ কথা কোন আদালতই মেনে নেবে না।

সুতরাং যদি তাই হয়, তাহলে এ কথা প্রমাণ হল যে, মালিক যা কিছু বাড়িয়েছিল, তা মজুরের মজুরীর চাল থেকে বাড়ায়নি বরং তা নিজের মাল থেকেই বাড়িয়েছিল।[৬৮]

তবুও এ ব্যক্তি মজুরের জন্য যা কিছুই করেছে, তা নিছকভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করেছে। আর এর সাথে যে তার নিজেরও লাভ হবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা পাবে বা ধনবৃদ্ধি হবে এসব উদ্দেশ্য তার মোটেই ছিল না। সুতরাং সে গাইপাল ও রাখাল সেই মজুরকে দিয়ে নিছক অনুগ্রহ ও বদান্যতা প্রকাশ করেছিল। যার ফলেই সে উক্ত কর্মের অসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলে তিনি তা শ্রবণ করেছিলেন।

এবারে উক্ত হাদীস দ্বারা এই প্রমাণ করা যে, মালিক তার মজুরের মজুরীর চাল নিয়ে তার অনুমতি ছাড়াই ব্যবসা করেছিল---সে কথা নিছক ভুলই নয়; বরং ভিত্তিহীন এবং হাস্যকরও। আর এর চাইতে বেশী হাস্যকর কথা হল এই যে, ইমাম বুখারীর মত দূরদর্শী মুজতাহিদকেও এ ব্যাপারে টেনে আনা হয়েছে; বলা হয়েছে “ইমাম বোখারী (রঃ) এই তৃতীয় প্রকার ব্যবসার বিষয় এভাবে উল্লেখ করেছেন- باب التجارة في مال غيره بغير إذنه!! কিন্তু আপনি পুরো সহীহুল বুখারী পড়ে দেখুন, উক্তরূপ শব্দে কোন ‘বাব’ই খুঁজে পাবেন না। سبحانك هذا بهتان عظـــيم (এটা একটি বড় অপবাদ এবং সত্যের অপলাপও।)

ইসলামের মত এমন ন্যায় ও নৈতিকতাপূর্ণ দ্বীন সম্বন্ধে কিভাবে একথা বিশ্বাস করা যায় যে, তাতে এক ব্যক্তির মাল-ধনে তার অনুমতি ছাড়াই অপর ব্যক্তির ঠিক মালিকের ন্যায় ইচ্ছামত এখতিয়ার চালানোর অনুমোদন আছে। এটি ইসলামের একটি এমন সন্দিগ্ধ ও বিকৃত ব্যাখ্যা,

[68] (দেখুন, ফাতহুল বারী ৫/২১)

যা কোন সঠিক চিন্তাবিদ্ মানুষ সঠিক বলতে পারেন না। নিম্নের হাদীসটিকে ঠান্ডা মাথায় পড়ুনঃ-

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِعْ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِه.

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন তার ভায়ের পয়গামের উপর কোন নারীকে পয়গাম না দেয় এবং তার ভায়ের কেনা-বেচার উপর তার বিনা অনুমতিতে কেনা-বেচা না করে।[৬৯]

একটু ভেবে দেখুন, ইসলাম যখন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজস্ব পয়সা দিয়েও ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করছে, তখন অন্য জনের পয়সা দিয়ে তার অনুমতি ছাড়াই ক্রয় বিক্রয়কে কি করে বৈধ করতে পারে?

পক্ষান্তরে ব্যাংক এবং অনুরূপ কোন সংস্থা নিছক অর্থপূজা, ব্যবসা ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার, সুবিধা ভোগ এবং অর্থ শোষণ করার অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্যে এই থাকে যে, সূদের লোভ দেখিয়ে জনগণ ও জাতির ধন-মাল যতবেশী আকারে সম্ভব নিজেদের আয়ত্তে আনা হবে এবং এই পদ্ধতিতে নিতান্ত চাতুর্যের সাথে সমগ্র জাতির উপর স্বীয় ক্ষমতা ও শাসন চালানো হবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে দুর্ভিক্ষ আনা যাবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে অনাহার সৃষ্টি করে বিনাশ আনয়ন করা হবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের পছন্দমত শাসন ও রাজনীতি প্রয়োগ করা যাবে। যখন ইচ্ছা তখন মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং যখন ইচ্ছা তখন মুদ্রামান বর্ধিত করে মার্কেটে ব্যাপক আকারে মন্দা ছড়ানো যাবে। যাকে ইচ্ছা গদিচ্যুত এবং যাকে ইচ্ছা তাকে গদীনশীন করা সহজ হবে।

প্রিয় পাঠক! এবারে আপনি নিজেই ফায়সালা করতে পারেন যে, (মুখলিস সৎব্যবসায়ীর) নিছক দ্বীনদারী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ভিত্তিতে করা কারবারের উপর নিছক দুনিয়াদারী ও অর্থপিশাচ-সুলভ কারবারকে কিয়াস করা এবং এর ফলে ব্যাংকের কারবারকে বৈধ করা কতদূর সঠিক ও যথার্থ হতে পারে?

[69] (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুঅত্তা, মিশকাত ৩১৪৪নং)

পুনরায় আর একবার আপনি তিনটি হাদীসকেই মন দিয়ে পড়ুন এবং দেখুন, তাতে কোথাও কি এমন কথা আছে যে, 'ভাইসকল! তোমরা আমাদেরকে তোমাদের পুঁজি সোপর্দ কর, আমরা সে পুঁজির হিফাযতও করব এবং উল্টে তার উপর সূদও আদায় করব?'

আরও খেয়াল করে দেখুন, তাতে কি এ ধরনের কোন শর্ত বা নির্ধারণ আছে যে, 'যদি তোমাদের টাকা আমাদের নিকট এক বছর থাকে, তাহলে ৮% ইনটারেষ্ট দেব, পাঁচ বছর থাকলে ডবল লাভ দেব আর দশ বছর থাকলে তিন ডবল দেব? অর্থাৎ মেয়াদ যত লম্বা হবে তত বেশী হারে আমরা তার লভ্যাংশ (?) আদায় করে যাব?'

উপরন্ত বিলম্ব ও সময়ের বিনিময়ে শর্ত ও নির্ধারণের সাথে মূলধন ছাড়া কিছুও বেশী দেওয়া অথবা নেওয়ার নামই হল সূদ। আপনি পুনরায় আর একবার সূদের সংজ্ঞার্থ এবং জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত সূদকে নিয়ে চিন্তা করে দেখুন। তাতে আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ব্যাংকের সূদ ও জাহেলিয়াতের সেই সূদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই ; যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সূদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা'

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! ব্যাংকের সূদ হারাম হওয়ার কথা এখান থেকেই শেষ হয়ে যায়নি। বরং মুসলিম বিশ্ব তথা অন্যান্য বিভিন্ন দেশের রাজধানী শহরে এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন কনফারেন্স ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সে সব সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় যে, ব্যাংকের সূদ নিশ্চিতরূপে হারাম; যার হারাম হওয়াতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতির প্রথম সম্মেলনে বিশ্বের তিন শতাধিক ফিক্হ ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের সকলেই একবাক্যে ব্যাংকের সূদকে হারাম বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কোন এক জনও সে সূদকে হালাল বলে মতবিরোধ প্রকাশ করেননি। বরং অধিক খুশীর কথা এই ছিল যে,

উলামায়ে ইসলামের তুলনায় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণই উক্ত সূদকে হারাম করার ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৭০]

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! পরিশেষে আমরা আপনার অবগতির জন্য এ কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত মনে করি যে, বিভিন্ন ফিক্হী, ইসলামী ও অর্থনৈতিক কনফারেন্স, সংগঠন ও সেমিনারের মাধ্যমে ব্যাংকের সূদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে (গণ্যমান্য) উলামাগণের ইজমা' (সর্ববাদিসম্মতি) সংঘটিত হয়ে গেছে। সকলের রায় মতে বলা হয়েছে যে, এটা হল সেই সূদ, যার হারাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা অবশিষ্ট নেই। উক্ত ইজমা ১৯৬৫ সাল থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। আমাদের জন্য তিনটি বিশ্বসম্মেলনে সংঘটিত ইজমা'ই যথেষ্টঃ-

(১) মুহার্রাম ১৩৮৫ হিঃ মুতাবেক মে ১৯৬৫ খ্রিঃ তে মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর দ্বিতীয় সম্মেলনে সংঘটিত ইজমা'।

(২) ১২-১৯ রজব ১৪০৬ হিঃ তে মক্কা মুকার্রামায় অবস্থিত মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের ইসলামিক ফিক্হ একাডেমীর ইজমা'।

(৩) ১০-১৬ রবীউসসানী ১৪০৬ হিঃ মুতাবেক ২২-২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রিঃ তে অনুষ্ঠিত অরগানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্সের ইসলামিক ফিক্হ একাডেমীর ইজমা'।

যেহেতু উপরোল্লেখিত কনফারেন্সসমূহে প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু আমরা কেবল কায়রোতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর দ্বিতীয় কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীর খসড়া এখানে নকল করাকে যথেষ্ট মনে করছি। উল্লেখ্য যে, উক্ত কনফারেন্সে ৩৫টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুহর্রাম ১৩৮৫ হিঃ মুতাবেক মে ১৯৬৫ খ্রিঃ তে অনুষ্ঠিত ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর দ্বিতীয় কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ঃ-

১ - যে কোন প্রকারের ঋণের উপর ইনটারেষ্ট নেওয়া হল হারাম সূদ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাতে সে ঋণ ব্যক্তিগত অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে নেওয়া হোক অথবা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে নেওয়া হোক; কোন পার্থক্য নেই।

[70] (ফাওয়াএদুল বুনূক হিয়ার রিয়াল হারাম, ডক্টর ইউসুফ কারযাবী)

কারণ, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তিসমূহ উভয় প্রকারেরই ঋণভিত্তিক সূদকে হারাম নিরূপণ করেছে।

২- সূদ চাহে স্বল্প পরিমাণের হোক অথবা অধিক পরিমাণের; সর্বাবস্থায় তা হারাম। আয়াতে উল্লিখিত 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে (দ্বিগুণ-চতুর্গুণ) সূদ ভক্ষণ করো না' এর সঠিক মর্মার্থ তাই।

৩- ঋণের উপর সূদ গ্রহণ করা হারাম। কোন প্রকারের প্রয়োজন এবং কোন প্রকারেরই অবস্থা ও পরিস্থিতিতে তা জায়েয হতে পারে না। অনুরূপ ঋণের উপর সূদ দেওয়াও হারাম। তবে সূদী ঋণ (বা লোন) গ্রহণের গোনাহ কেবল তখনই ক্ষমার্হ হবে, যখন কেউ সূদ বিনা ঋণ কোথাও না পাবে।

সেক্ষেত্রে কেবল নিরুপায় অবস্থায় বাধ্য হয়েই তা গ্রহণ করলে তা মাফযোগ্য। অবশ্য নিরুপায় অবস্থা নির্ধারণ করাটা প্রত্যেকের দ্বীনদারী অনুভব-সাপেক্ষ।

৪- কারেন্ট একাউন্ট ও এল সি খোলা, চেক ও ড্রাফ্‌ট ভাঙ্গানো এবং দেশের ভিতরে বিল অফ্‌ এক্সচেঞ্জ (হুন্ডি)র যে কারবার ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর সাথে করে থাকে---তা জায়েয। পরন্তু এসব সেবার উপর ব্যাংক যে ফী গ্রহণ করে---তা সূদ নয়।

৫- স্থায়ী আমানত (FIXED DEPOSIT) সূদবিশিষ্ট এল সি খোলা এবং সূদ ভিত্তিক ঋণ বা লোন দেওয়া ইত্যাদি কারবার সূদী ও হারাম কারবার।

১৯৬৫ সালের ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা ঃ-

	নাম	সাং	পেশা
১	হাসান মামূন (বড় ইমাম)	মিসর	আযহার ইউনিভার্সিটির দ্বীনি শিক্ষক
২	ডক্টর ইব্রাহীম আব্দুল মাজীদ লাব্বান	মিসর	দারুল উলুমের ভূতপূর্ব সভাপতি
৩	ডক্টর ইসহাক মূসা হুসাইনী	প্যালেষ্টাইন	আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এবং এ্যারাবিক ইউনিভার্সিটির পি জি বিভাগের প্রফেসর
৪	ডক্টর সুলাইমান হারীন	মিসর	অসয়ূত ইউনিভার্সিটির ডিরেক্টর
৫	ডক্টর আব্দুল হালীম মাহমূদ	মিসর	অসূলুদ্দীন কলেজের সভাপতি

৬	উস্তায আব্দুল হামীদ হাসান	মিসর	দারুল উলূম কলেজের ভূতপূর্ব প্রফেসর।
৭	শায়েখ আব্দুর রহমান হাসান	মিসর	আযহার ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব উপাচার্য
৮	শায়খ আব্দুর রহমান কালহূদ	লিবিয়া	ভূতপূর্ব বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী
৯	উস্তায আব্দুল্লাহ কানূন	মরক্কো	মরক্কো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং তানজার ভূতপূর্ব গভর্নর
১০	ডক্টর উসমান খলীল উসমান	মিসর	কায়রোর হুকুক কলেজের আইনবিষয়ক লেকচারার
১১	ডক্টর আলী হুসাইন আব্দুল কাদির	মিসর	শরীয়াহ কলেজের সভাপতি
১২	শায়খ আলী খাফীফ	মিসর	হুকূক কলেজের শরীয়ত বিষয়ক ভূতপূর্ব লেকচারার
১৩	শায়খ আলী আব্দুর রহমান	সুদান	ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
১৪	শায়খ মুহাম্মদ আহমদ আবু যুহরাহ	মিসর	হুকূক কলেজের শরীয়ত বিষয়ক ভূতপূর্ব লেকচারার
১৫	শায়খ মুহাম্মদ আহমদ ফারাজ সিনহুরী	মিসর	ভূতপূর্ব ওয়াক্‌ফ মন্ত্রী
১৬	ডক্টর মুহাম্মদ বাহী	মিসর	ভূতপূর্ব ওয়াক্‌ফ মন্ত্রী
১৭	ডক্টর মাহমূদ হিব্বুল্লাহ		ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমীর সেক্রেটারী জেনেরাল
১৮	উস্তাদ মুহাম্মদ খালফুল্লাহ আহমদ	মিসর	'আইন শাম্‌স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য
১৯		মিসর	
২০	ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আরাবী	মিসর	ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ইসলামিক ষ্টাডীর সভাপতি এবং হুকূক কলেজের ভূতপূর্ব লেকচারার
২১	ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মাযী		আযহার ইউনিভার্সিটির উপাচায
২২	শায়খ মুহাম্মদ আলী সায়েস		উসূলুদ্দীন কলেজের ভূতপূর্ব উপাচার্য শায়খ মুহাম্মদ ফাযেল বিন আশূর টুনিসিয়া যাইতুনাহ ইউনিভার্সিটির সভাপতি এবং টুনিসিয়ার মুফতী
২৩	ডক্টর মুহাম্মদ মাহদী আল্লাম ইউনাইটিড		মিনিস্ট্রী অফ আরব রিপাবলিক কালচার এ্যান্ড গাইডেন্স-এর (মিসর) টেকনিক্যাল কাউন্সিলার

২৪	শায়খ মুহাম্মদ নূরুল হাসান		আযহার ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব উপাচার্য
২৫	শায়খ নাদীম জিস্‌র	লেবানন	ত্রিপোলী ও উত্তর লেবাননের মুফতী
২৬	উস্তায আফীক কাস্‌সার	লেবানন	হুকূক কলেজের ভূতপূর্ব সভাপতি

এছাড়া আরো বহুসংখ্যক উলামার নাম সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

মিসরের (প্রধান) মুফতী ব্যাংকের সুদ হালাল হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে আযহার ইউনিভার্সিটির উলামাবৃন্দ মক্কা মুকার্রামায় সমবেত হয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি প্রচার করেন। উক্ত প্রতিবাদে সমর্থক উলামাবৃন্দের ৩৩টি নাম, পেশা ও স্বাক্ষর-সম্বলিত খসড়া মজুদ রয়েছে।

সূদী ব্যাংকের প্রতিকল্প

পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম-রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তার বর্তমান কর্ম-পদ্ধতির ভিত্তিই হল সূদ। এবারে এখানে একটি প্রশ্ন সকলের মনে উঁকি দিতে বাধ্য যে, যদি সূদকে নিশ্চিহ্ন করা হয়, তাহলে ব্যাংকের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিকল্প পথ কি হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু প্রস্তাব রাখা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না ঃ-

১- সূদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প কোন ব্যবস্থা খোঁজার অর্থ এই যে, ব্যাংকের যে সমস্ত কার্য বর্তমান বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে জরুরী ও উপকারী তা পরিচালনার জন্য এমন কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক, যা শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার অনুকূল এবং যাতে শরীয়তের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে। পক্ষান্তরে যে সব কার্যাবলী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার মাপকাঠিতে জরুরী অথবা উপকারী নয় এবং যে সব কার্যাবলীকে শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার ছাঁচে ঢালা সম্ভবপর নয়, তা থেকে দূরে থাকা হোক।

২- যেহেতু সূদের আইনসম্মত বিধিনিষেধের প্রভাব সমগ্র অর্থবন্টন সংক্রান্ত ব্যবস্থার উপরই পড়তে বাধ্য, সেহেতু এ ধরনের আশা করাও ভুল হবে যে, সূদী ব্যবসার শরয়ী প্রতিকল্পকে কার্যকর করা হলে সংশ্লিষ্ট সকল

ব্যক্তিবর্গের মুনাফার হার তা-ই থাকবে, যা সূদী ব্যবস্থায় ছিল; বরং বাস্তব তো এই যে, যদি ইসলামী বিধানসমূহকে সঠিক পর্যায়ে কার্যকর করা যায়, তাহলে উক্ত হারে বড় ধরনের এমন মৌলিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হবে, যা ইসলামী আদর্শ অর্থনীতির জন্য বাঞ্ছিত।

৩- আজকাল ব্যাংক জনসাধারণের যে সকল সেবা করে থাকে, তার মধ্যে একটা দিক খুবই উপকারী; আর তা হল এই যে, ব্যাংক বিভিন্ন সঞ্চয়ীর পৃথক পৃথক বিক্ষিপ্ত সঞ্চিত অর্থকে একত্রে জমা করে বিভিন্ন শিল্পায়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের খাতে ব্যবহার করায় মধ্যস্থতা করে থাকে। এ সমস্ত সঞ্চিত অর্থ যদি প্রত্যেক সঞ্চয়ীর সিন্দুকে পড়ে থাকত, তাহলে তার দ্বারা শিল্প ও ব্যবসার কোন উন্নয়ন প্রকল্পে উপকার লাভ সম্ভব হত না। কিন্তু সেই সঞ্চিত অর্থসমূহকে শিল্প ও বাণিজ্যকর্মে বিনিয়োগ করার যে পথ ও পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংকগুলো অবলম্বন করেছে, তা হল ঋণ দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতি।

তাই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজিপতিদেরকে এই বলে আশ্বাস ও উৎসাহ দান করে থাকে যে, তারা যেন অপরের আর্থিক উপকরণসমূহকে নিজেদের মুনাফা ও স্বার্থে এমনভাবে প্রয়োগ করে, যাতে এ উপকরণসমূহ থেকে সৃষ্ট অর্থের অধিক অংশ তাদের নিজেদের আয়ত্তে থাকে এবং পুঁজির আসল মালিকদের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াবার যথার্থ সুযোগ লাভ না হয়।

অতএব ইসলামী নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে ব্যাংককে এমন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে; যে বহু সংখ্যক সঞ্চয়ী মানুষদের সঞ্চিত অর্থকে জমা করে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন কারবারে বিনিয়োগ করবে এবং এ সকল সঞ্চয়ীগণ সরাসরিভাবে এ কারবারের অংশীদার হতে পারবে। তাদের লাভ-নোকসান এ কারবারের লাভ-নোকসানের সঙ্গে জড়িত ও সম্পৃক্ত থাকবে; যে কারবার তাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা করা হচ্ছে।

৪- বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা কোন জরাজীর্ণ নিয়ম-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে তার পরিবর্তে কোন নতুন নিয়ম-ব্যবস্থা চালু করতে সত্যই বহু সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তা বলে সেই সমস্যা ও অসুবিধাকে ভিত্তি করে উক্ত নতুন নিয়ম-ব্যবস্থাকে চলার অযোগ্য মনে করা সঠিক নয়।

এমতাবস্থায় আগত সমস্যার বিশেষ সমাধান বের করতে হবে এবং সেই নিয়ম-ব্যবস্থাকেই কার্যকর রাখতে হবে।

ব্যাংকের শরয়ী নিয়ম-পদ্ধতি

ব্যাংকের সম্বন্ধ থাকে দ্বিপাক্ষিক; এক পক্ষের সম্বন্ধ সেই লোকদের সাথে থাকে, যারা নিজেদের টাকা তাতে জমা রাখে। আর দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধ সেই লোকেদের সহিত থাকে, যাদের জন্য ব্যাংক পুঁজি সরবরাহ এবং অর্থসংস্থান করে থাকে। এই উভয় প্রকার সম্বন্ধ নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা করা আবশ্যক ঃ-

ব্যাংক এবং ডিপোজিটারের সম্বন্ধ ঃ-

বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংকে যে অর্থ জমা রাখা হয় তাকে ব্যাংকের পরিভাষায় 'আমানত' বলা হয়। কিন্তু ইসলামী ফিকহী দৃষ্টিতে তা হল বাস্তবিক ঋণ। এবারে যদি ব্যাংককে ইসলামী নীতি অনুসারে চালানো যায়, তাহলে আমানতকারীদের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক হবে পার্টনারশিপ অথবা 'মুযারাবাহ'র। এই নিয়মে জমা রাখা এ অর্থ ঋণ গণ্য হবে না; বরং তার পজিশন এই দাঁড়াবে যে, টাকা জমাকর্তা (আমানতকারী) হবে টাকার মালিক এবং ব্যাংক হবে তার মুযারিব (ব্যবসাকারী)। আর বিনিয়োজিত অর্থ মূলধন হবে; যার উপর ব্যাংক কোন নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দিতে বাধ্য থাকবে না। বরং ব্যবসায় যেটুকু পরিমাণেই লাভ অর্জিত হবে, সেইটুকু লাভই পূর্বচুক্তি অনুসারে (যেমন, এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ) হার অনুপাতে উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হবে।

কারেন্ট একাউন্টের ক্ষেত্রে আজকালের সূদী ব্যাংকগুলোও আমানতকারীকে কোন সূদ আদায় করে না। ইসলামী ব্যাংকেও অনুরূপভাবে এ একাউন্টে রাখা টাকার উপর কোন মুনাফা দেওয়া হবে না। আর আমানতকারীর কারেন্ট একাউন্টে রাখা টাকা ব্যাংকের জন্য বিনা সূদের ঋণ বলে ধরা হবে। তবে অন্যান্য কল্যাণকর আমানত 'মুযারাবাহ' অথবা 'শির্কত' (পার্টনারশিপ) কারবারে পরিগণিত হবে।

ব্যাংকের পার্টনারশিপ ও মুযারাবাহ কারবারে উপার্জিত মুনাফা ভাগবন্টনের পদ্ধতি এরূপ হবে যে, অংশীদারদিগকে তাদের নিজ নিজ ইচ্ছামত বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তিতে ব্যাংকে টাকা রাখার অথবা তা হতে টাকা তোলার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু যখন শির্কতের একটি নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে, তখন দেখতে হবে যে, সেই সময়ের মধ্যে কত টাকা কত দিন যাবৎ ব্যাংকে ছিল এবং তার প্রত্যেক টাকায় দৈনিকহারে মুনাফার গড় হিসাব কত? অতঃপর যে ব্যক্তির যত টাকা এ নির্ধারিত মেয়াদের যতদিন ব্যাংকে থাকবে, ততদিন হিসাবে সেই ব্যক্তিকে তার লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

অর্থসংস্থানের ইসলামী পদ্ধতি

এবারে ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'ফিন্যানসিং' বা অর্থসংস্থান করা; অর্থাৎ অপরকে ব্যবসা ইত্যাদির জন্য পুঁজি যোগাড় করে দেওয়ার ইসলামী বিভিন্ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা যাক। শরয়ী দৃষ্টিকোণে এর কতকগুলি পদ্ধতি হতে পারে ঃ-

১- শির্কত ও মুযারাবাহ ঃ সূদের সঠিক ও বিকল্প ইসলামী ব্যবস্থা হল শির্কত (অংশীদারী হয়ে ব্যবসা) এবং মুযারাবাহ (একজনের পুঁজি ও অপরজনের শ্রম ব্যয়ে ব্যবসা)। এ ধরনের ব্যবসার সুফল সূদী কারবারের তুলনায় বহুগুণে বেশী। আর উক্ত প্রকার ব্যবসায় অংশগ্রহণ করাই হল অর্থসংস্থানের নিতান্ত আদর্শ-ভিত্তিক ন্যায়সংগত ও ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি; যাতে লভ্যাংশ ভাগাভাগির ক্ষেত্রেও বড় সুফল সন্নিবিষ্ট থাকে।

শির্কত ও মুযারাবাহর নিয়ম-ব্যবস্থা জারী হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত কারবারে রীতিমত ব্যাংকের কর্তৃত্ব চলবে। অর্থাৎ এক্ষণে তার পজিশন কেবল টাকা জমা রাখা ও তোলার কোন প্রতিষ্ঠানের মতই থাকবে না।

মূলতঃ ইসলামী ফিন্যানসিং পদ্ধতি শির্কত বা মুযারাবাহ হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে মুযারাবাহর রূপ দান করা সম্ভব হয় না। যেমন; কোন এক কৃষককে একটি ট্রাক্টর খরীদ করার জন্য পুঁজির প্রয়োজন হলে তাকে 'মুযারাবাহ' রূপে পুঁজি সংস্থান করা সম্ভব নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আরো কয়েকটি ফিন্যানসিং পদ্ধতি নিম্নরূপঃ-

২- ইজারা ঃ এটিও একটি শরয়ী ফিন্যানসিং পদ্ধতি; যাকে ইংরাজীতে (LEASING) (লীজ দেওয়া) বলে। এর নিয়ম হল এই যে, কৃষক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিজে ট্রাক্টর ক্রয় করার পরিবর্তে কোন ব্যাংক অথবা অর্থ প্রতিষ্ঠানকে আবেদন জানাবে, যাতে এ ট্রাক্টর কিনে তাকে ভাড়া দেওয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে ট্রাক্টরের মালিক হবে উক্ত ক্রয়কারী ব্যাংক বা অর্থ প্রতিষ্ঠান। আর কৃষক ভাড়াগ্রহণকারী হিসাবে তা গ্রহণ করবে। ভাড়া এমন হারে নির্ধারিত করা হবে, যেন তাতে ট্রাক্টরের দামও অসূল হয়ে যায় এবং ততটা মেয়াদের জন্য উক্ত অংকের অর্থ দ্বারা ব্যাংকের অংশীদারী কারবারে অংশী হলে যে মুনাফা আসত তাও লাভ হয়। যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে এবং ভাড়া আকারে প্রাপ্ত টাকার মাধ্যমে ট্রাক্টরের মূল্য তথা কিছু লাভও ওসূল হয়ে যাবে, তখন সেই ট্রাক্টরটি এ কৃষকের মালিকানাধীন থেকে যাবে।

৩- বিলম্বিত মুনাফা অর্জন ঃ এটি এরূপে হবে যে, যখন কোন ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আসবে, তখন তাকে কোন্ জিনিস ক্রয় করার জন্য ঋণ নেবে তা প্রশ্ন করা হবে। ব্যাংক তাকে টাকা দেওয়ার পরিবর্তে তার সেই দরকারী জিনিস নিজে ক্রয় করে পুনরায় তাকে লাভ রেখে ধারে বিক্রয় করবে। (সে ব্যক্তি তা সংগ্রহ করে কিস্তিতে টাকা মিটাবে।) লাভের একটি নির্দিষ্ট হার স্থির করে মুনাফালাভ এ জন্যই করা হবে; যাতে নিয়ম-ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট থেকেই লাভ একই হারে আদায় করা সম্ভব হয়। এই লাভের যে নির্দিষ্ট হার স্থির করা হয় তাকে ইংরাজীতে (MARK UP) (মার্ক আপ) বলা হয়।

এরূপ বিলম্বিত মুনাফা লাভের সাথেও অর্থসংস্থান করা এক প্রকার বৈধ ফিন্যানসিং হতে পারে। তবে এতে শর্ত এই যে, তা যেন সঠিক আকারে জরুরী শর্তাবলী পালনের সাথে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু ধারে বিক্রয়ের জন্য দাম বেশী নেওয়া ফকীহগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে বৈধ। পরন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলোতেও এই শেষোক্ত পদ্ধতির উপর বড় ব্যাপক আকারে আমল করা হচ্ছে। কিন্তু এটা নেহাতই স্পর্শকাতর পদ্ধতি। কারণ এতে কিঞ্চিৎ পরিমাণের অসাবধানতা একে বৈধ কারবার থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে সূদী কারবারের ভাগাড়ে ফেলে দিতে পারে।

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইসকল! সূদী কারবার হল সর্বনাশী ও বিশ্ব বিধ্বংসিতার দুয়ার ও পথ এবং ব্যাংক হল তার আন্তর্জাতিক বাজার। আর এই হল সেই সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে আমলযোগ্য ইসলামী পদ্ধতি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ঃ

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

অর্থাৎ, ---আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা বিশদভাবে তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন; তবে নিরুপায় অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। (সূরা আনআম ১১৯ আয়াত)

যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর হারামকৃত জিনিসগুলোকে বিশদ ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন সেহেতু যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করে সূদ থেকে বাঁচা একজন পাক্কা-সাচ্চা মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। বরং যেখানে সূদের গন্ধ আছে, যে পয়সায় সূদের মিশ্রণ আছে বলে সন্দেহ আছে সেখান ও সে পয়সা হতে দূরে থাকাও তার জন্য জরুরী। কেন না যে ব্যক্তি আল্লাহর (হারাম) সীমারেখার ধারেপাশেই ঘোরাফেরা করে তার জন্য এই আশঙ্কা থাকে যে, কখন যে তার পা পিছল কেটে এ হারাম ও নিষিদ্ধ সীমায় গিয়ে আপতিত হয়ে যাবে, সে তার আদৌ টের পাবে না।

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আরো একটি ভয় সর্বদা এই রাখা ওয়াজেব যে, যাতে সে নিজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সেই বাণীর মূর্তপ্রতীক না হয়ে যায়, যাতে তিনি বলেছেন,

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ فِيهِ بِمَا أَصَابَ مِنَ الْمَالِ أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَام.

অর্থাৎ, "মানুষের উপর এমন একটি যুগ (অবশ্যই) আসবে, যখন সে এ কথার কোন পরোয়াই করবে না যে, সে যা গ্রহণ (উপার্জন) করছে তা হালালের শ্রেণীভুক্ত অথবা হারামের।" (বুখারী ২০৫৯, ২০৮৩নং)

উপরন্তু এ ভয়েও মুসলিমকে কেঁপে ওঠা দরকার যে, যাতে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই বাণীর মূর্তপ্রতীক না হয়ে যায়, যাতে তিনি বলেছেন,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

"আমার উম্মতের একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা অবশ্যই পান করবে।" (মুসনাদে আহমদ ৫/৩৪৩, সহীহুল জামে ৫৪৫৩নং)

সুতরাং অনুরূপভাবে সেও সূদের মনোলোভা হালালসূচক নাম 'লভ্যাংশ, বোনাস বা অনুদান' দিয়ে তা ভক্ষণ করছে না তো? অথচ খোদ ব্যাংকওয়ালারা তার নাম রেখেছে সূদ বা ইনটারেষ্ট। আর যথার্থতা ও প্রকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য দুশমনের সাক্ষ্যই অধিক ফলপ্রসূ।

যারা ব্যাংকের সূদকে হালাল বলে ফতোয়া দেন তাঁদেরকে নিজেদের উক্ত ফতোয়া নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। নচেৎ এ রকম তো নয় যে, তাঁরা ইসলামের দুশমনদের সহায়তা এবং আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যা রচনা করেছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, ঃ

﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾

অর্থাৎ, (হে নবী! তুমি) বল, 'কি রায় তোমাদের, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুজী দান করেছেন তোমরা যে তার কিছুকে অবৈধ ও বৈধ করে নিয়েছ'; বল, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন; নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?' (সূরা ইউনুস ৫৯ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, ঃ

﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ মিথ্যা বের হয়ে আসে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, 'এটা হালাল আর এটা হারাম।' নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবে না। (সূরা নাহ্‌ল ১১৬ আয়াত)

অথবা তাঁরা এ কথার বাস্তব নমুনা তো নন, যে কথা আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছিলেন, 'হে ইবনে আব্বাস! আর কতদিন যাবৎ লোকদেরকে সূদ খাওয়াতে থাকবেন? শুধু আপনি কি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহচর্য পেয়েছেন, আর আমরা পাইনি? শুধু আপনিই কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, আর আমরা শুনিনি?' এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বললেন, 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়; বরং উসামা বিন যায়েদ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সূদ তো কেবল ঋণেই পাওয়া যায়।" তা শুনে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন,

والله لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول.

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! ততদিন পর্যন্ত কোন গৃহের ছায়া আমাদেরকে আশ্রয় দেবে না, যতদিন পর্যন্ত আপনি উক্ত ফতোয়ার উপর অটল থাকবেন! (অর্থাৎ, ততদিন আমি আপনার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করব না।) *(দেখুন, আল মাবসূত্ব, সারখাসী ২/১১১-১১২, মাওয়াক্বিফুশ্ শারীআতি মিনাল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাতিল মুআসিরাহ)*

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ফতোয়া ছিল যে, কেবল ঋণের কারবারেই সূদ পাওয়া যায় এবং একই শ্রেণীভুক্ত দুটি জিনিসের কম বেশী করে হাতেহাতে লেন-দেনে সূদ হয় না। যেমন, সোনার পরিবর্তে সোনা বেশী (হাতেহাতে) নেওয়া বৈধ । অথচ তা উবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসের স্পষ্ট উক্তি অনুসারে হারাম ও সূদ। অবশ্য পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই হাদীস শুনে তাঁর উক্ত ফতোয়া দান করা হতে বিরত হয়েছিলেন। *(দেখুন, মুগনী, ইবনে কুদামাহ ৪/৩)*

আমার প্রিয় মুমিন ভাই! যদি আমাদের কেউ না জানার কারণে অথবা কোন শয়তানী চক্রান্তে পড়ে অথবা মনের কুপ্রবৃত্তিবশে অথবা কারো ফতোয়ায় ধোঁকা খেয়ে ব্যাংক থেকে সূদ নিয়ে তা ব্যবহার করে ফেলেছে, কিংবা (বিকল্প উপায় থাকা সত্ত্বেও) ব্যাংক থেকে লোন বা ঋণ নিয়ে তাকে সূদ প্রদান করেছে, তাহলে তার অপরিহার্য কর্তব্য হল সত্বর তওবা করা এবং এই সংকল্প করা যে, আমরা আর সূদ নেওয়া ও দেওয়ার মত বড় গোনাহতে নির্বিচল থাকব না। বরং সেই সকল লোকেদের দলভুক্ত হতে যথাসাধ্য প্রয়াস করব, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

অর্থাৎ, (তারা মুত্তাকীন) যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তাই (বারবার) করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত; যার তলদেশে প্রবাহিত আছে বিভিন্ন প্রস্রবণ---সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে। আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্যে কতই না চমৎকার প্রতিদান! *(সূরা আ-লি ইমরান ১৩৫-১৩৬ আয়াত)*

সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট নিজ কৃতপাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হব। আল্লাহ অবশ্যই নিতান্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় ও দয়াবান। তাঁর নিকট কোন সংকীর্ণতা নেই। তিনি তো আমাদেরকে পাপমুক্ত করতে চান। অতএব যতশীঘ্র সম্ভব তত শীঘ্রই আমাদেরকে গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ঃ

﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ সম্পূর্ণ

করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত)
তিনি আরো বলেন,

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾

অর্থাৎ, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের জন্য এখনো কি সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণ ও সত্য অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে উঠবে?[৭১]

সূদের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বাঁচার উপায়

আমার প্রিয় ভাই! এখন আপনাকে সেই উপায় ও পথের সন্ধান বলে দিই, যা অবলম্বন করলে আপনি সূদের বিপদজনক ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার পেতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও আপনাকে সেই তওফীকই দান করুন এবং তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করাকে আমাদের পক্ষে সহজ করে দিন। আমীন।

১- সূদ নেওয়া ও দেওয়ার মাঝে পার্থক্য ঃ-

সূদ নেওয়া এবং দেওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে। উভয় কর্ম একই পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা নিরুপায় অবস্থায় সূদভিত্তিক ঋণ নিতে বহু মানুষই বাধ্য হতে পারে। সুতরাং যদি এমন কোন বিপদ ও প্রয়োজন দেখা দেয় যার কারণে সূদের উপর ঋণ নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না অথবা জান বা ইজ্জতের পক্ষে এমন ক্ষতিকর অসুবিধা এসে দেখা দেয়, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঋণের প্রয়োজন হয় এবং সূদ ছাড়া ঋণই না পাওয়া যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন গত্যন্তরহীন মুসলিমের জন্য সূদভিত্তিক ঋণ নেওয়া বৈধ। পক্ষান্তরে সূদ খাওয়ার জন্য বাস্তবপক্ষে কোনই নিরুপায় অবস্থা নেই। সূদ তো কেবল ধনী লোকই গ্রহণ করে থাকে। আর ধনী লোকেরা এমন কোন্ গত্যন্তরহীন অবস্থায় পড়তে পারে যে, যার ফলে তার জন্য সূদ হালাল হয়ে যাবে?

২- প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ ঃ-

[71] (সূরা আল-হাদীদ ১৬ আয়াত)

সূদী ঋণ নেওয়ার জন্য প্রত্যেক 'প্রয়োজন নিরুপায়' অবস্থার সংজ্ঞায় পড়ে না। সুতরাং বিবাহ-শাদীতে ধুমধাম করার লক্ষ্যে অপব্যয় করা, আরাম-আয়েশ ও বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করা অথবা কোন ব্যবসা বা কারবারকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর করার মানসে অর্থ সংগ্রহ করা এবং এই ধরনের আরো অন্যান্য (অজরুরী) বিষয় যাকে 'প্রয়োজনীয় ও নিরুপায় অবস্থা' বলে আখ্যা দেওয়া হয় এবং যার জন্য হাজার হাজার টাকা মহাজন (বা ব্যাংকের) নিকট ঋণ নেওয়া হয়, তা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজনীয় ও গত্যন্তরহীন কর্ম ও বিষয় নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ শ্রেণীর ওজরের কোন গুরুত্বই নেই। তাই এ সকল কাজের জন্য যারা ঋণ নিয়ে সূদ দিয়ে থাকেন, তারা বিরাট গোনাহগার হবেন। শরীয়ত যদি কোন উপায়হীন অবস্থায় সূদ ভিত্তিক ঋণ নেওয়াতে অনুমতি দেয়, তাহলে তা কেবল সেই নিরুপায় অবস্থায়, যখন হারাম ভক্ষণ করা হালাল হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ঃ

﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যাপারে তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও তার কথা স্বতন্ত্র। (তখন হারাম হারাম নয়।)[৭২]

এখানে সেই সকল সামর্থ্যবান মুসলমানরাও গোনাহগার হবেন, যাঁরা বিপদকালে নিজেদের একজন ভাইকে (বিনা সূদে ঋণ দিয়ে) সাহায্য না করে তাকে (সূদী ঋণ নিয়ে) হারাম কাজ করতে বাধ্য করে থাকেন। বরং আমার মতে এই গোনাহর বোঝা সমগ্র মুসলিম জাতির ঘাড়েই চেপে বসবে; কারণ তারা যাকাত, সদকাহ, ওয়াক্ফ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক ফান্ডের ব্যাপারে বড় উদাসীন। যার তিক্ত ফলস্বরূপ সেই জাতিরই সদস্যরা অসহায় অবলম্বনহীন হয়ে নিজেদের অভাবের তাড়নায় সর্বগ্রাসী মহাজনদের সম্মুখে হাত পাতা ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পায় না।

৩- প্রয়োজনের তীব্রতা অনুপাতে প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ ঃ

অতিশয় নিরুপায় অবস্থাতেও কেবল প্রয়োজনের পরিমাণ অনুপাতে সূদী ঋণ করা যেতে পারে। (অর্থাৎ প্রয়োজনের অধিক টাকা ঋণ করা

[72] (সূরা আল-আনআম ১১৯ আয়াত)

যাবে না।) পরন্তু সামর্থ্য আসার সাথে সাথেই সর্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করে সূদ থেকে নিস্কৃতি লাভ করা জরুরী। কারণ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর সূদ হিসাবে একটি পয়সাও দেওয়া নিশ্চিত হারাম।

বাকী থাকল এই প্রশ্ন যে, 'প্রয়োজন অতীব কিনা? অতীব হলে তার পরিমাণ কতটা? কোন্ সময় সে প্রয়োজন দূরীভূত হবে?---' সুতরাং এসবের উত্তর অভাবী ব্যক্তির বিবেক এবং দ্বীনদারী অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। মানুষ যত বেশী দ্বীনদার এবং তার ঈমান যত বেশী মজবুত হবে, তত বেশী সে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান হবে।

৪- শুধুমাত্র নিজের ধনকে ধন মনে করুনঃ

যারা বাণিজ্যিক অসুবিধার কারণে অথবা নিজের ধন মালের হেফাযত ও সংরক্ষণার্থে ব্যাংকে টাকা রাখতে বাধ্য হন তাঁদের জন্য আবশ্যক হল, কেবল মাত্র জমা করা মূলধনকে নিজের ধন মনে করা এবং এ মূলধন থেকে বার্ষিক আড়াই শতাংশ হিসাবে যাকাত আদায় করা। কারণ এ ছাড়া অবশিষ্ট বেজন্মা অর্থরাশি তাঁদের জন্য নাপাক।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা (সূদ খাওয়া হতে) তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদের।[৭৩]

৫- সূদের টাকা নিরুপায় লোকেদের দেওয়া চলবেঃ

ব্যাংক অথবা ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে সূদে যে অর্থ আপসে হিসাবের খাতায় এসে যায়, তা নাপাক বলে না নিয়ে ব্যাংকওয়ালাদের কাছেই ফেলে আসা ঠিক নয়। কারণ ছেড়ে আসা টাকা উক্ত সূদী কারবারে অতিরিক্ত সহায়তা ছাড়া আরো বহু অজানা অঘটন ও পাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (আর আল্লাহ বলেন,

﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"পাপ ও অন্যায় কাজে তোমরা কেউ কারো সহায়তা করো না।"[৭৪]

[73] (সূরা বাক্বারাহ ২৭৯ আয়াত)

সুতরাং এর জন্য সঠিক পথ এই যে, তা ব্যাংক থেকে তুলে এনে সেই নিঃস্ব অভাবী, অসহায় প্রভৃতি গরীব মানুষদের মাঝে বিতরণ করে দিন, যাদের অবস্থা সেই নিরুপায় লোকদের মত যারা হারাম খেতে পারে। এ ব্যাপারে একজন ঈমানদার মুসলিমের লক্ষ্য হবে অমঙ্গল রোধ করা, মঙ্গল আনয়ন করা নয়। (সুতরাং পূর্ব থেকেই দান করার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাংকে টাকা রেখে তার সূদ দান করা বৈধ নয়।) সে যদি আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে, তাহলে তার জন্য হারাম থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করা থেকে রেহাই পাওয়াটা তার কারবারের (অসদুপায়ে) ক্রমোন্নতি এবং ধনাগমের চেয়েও অধিকতর পিয়ারা হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সেই তওফীকই দান করুন। আমীন।

বীমা বা ইনশ্যূরেন্স

বীমার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতের যে সকল সম্ভাব্য বিপদ আপদ ও দুর্ঘটনার মানুষ সম্মুখীন হয় তার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ধরনের দুর্ঘটনার আর্থিক ক্ষতি পূরণ দেবে বলে কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানী যমানত নেয়।

চতুর্দশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে এর সূত্রপাত ঘটে।

যেসকল দুর্ঘটনার উপর বীমা করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বীমার তিনটি বড় বড় প্রকার রয়েছেঃ-

১- মাল বীমা (GOODS INSURANCE) ঃ এর নিয়ম হল এই যে, যে ব্যক্তি কোন মালের উপর বীমা করতে চায় সে নির্দিষ্টহারে বীমা কোম্পানীকে কিস্তী (চাঁদা) আদায় করে যায়; যাকে প্রিমিয়াম (PREMIUM) বলা হয়। অতঃপর সেই মাল দুর্ঘনাগ্রস্ত হলে কোম্পানী তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। যদি মাল কোন প্রকারের দুর্ঘটনাগ্রস্ত না হয়, তাহলে বীমাকারী যে প্রিমিয়াম (কিস্তী) আদায় করেছে তা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অবশ্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমার টাকা বীমাকারী লাভ করে থাকে এবং তদ্দ্বারা সে নিজের ক্ষতিপূরণ করে থাকে। জাহাজ, গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতির বীমা এরই পর্যায়ভুক্ত।

[74] (সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)

২- ঝুঁকির বীমা ঃ এর অর্থ হল এই যে, ভবিষ্যতে কারো উপর কোন ঝুঁকি এলে সে ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বীমা করা। যেমন, মোটর গাড়ি চালাবার সময় কোন দুর্ঘটনার ফলে কোন অপর ব্যক্তির ক্ষতি হলে গাড়িচালকই সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ বীমা করা থাকলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত তৃতীয় পক্ষকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে বীমাপ্রতিষ্ঠান। যাকে সাধারণতঃ (THIRD PARTY INSURANCE) বলা হয়।

৩- জীবন-বীমা (LIFE INSURANCE) এর অর্থ হল এই যে, কোম্পানী বীমাকারীর সহিত এই চুক্তি করে যে, একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার (বীমাকারীর) অপমৃত্যু হলে বীমা-প্রতিষ্ঠান চুক্তিকৃত প্রতিশ্রুত টাকা তার ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)দেরকে আদায় করে দেবে।

এর আবার কতকগুলো ধরন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই মেয়াদের ভিতরে মারা গেলে চুক্তির টাকা মৃত বীমাকারীর ওয়ারেসীনরা পেয়ে যায়। যদি সে মেয়াদে তার মৃত্যু না হয়, তাহলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বীমাও শেষ হয়ে যায় এবং জমাকৃত টাকা সূদে-আসলে ফেরৎ পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে না।

এরূপ হলে যখনই বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তখনই তার টাকা তার ওয়ারেসীনরা পেয়ে যায়।

কর্মপদ্ধতি এবং কাঠামোগত ও গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে বীমা তিন প্রকারেরঃ-

১- গ্রুপ ইনস্যুরেন্স (GROUP INSURANCE) সরকার এমন এক পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে জনসাধারণের কোন একটি দল নিজেদের কোন ক্ষতিপূরণ অথবা কোন মুনাফালাভের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগ করতে পারে।

যেমন, সরকারী চাকরিজীবিদের বেতনের সামান্য একটা অংশ প্রত্যেক মাসে কেটে রেখে কোন বিশেষ এক ফান্ডে জমা করা হয়। অতঃপর কোন চাকরিজীবীর মৃত্যু হলে অথবা সে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে মোটা টাকা আকারে সাহায্য তার ওয়ারেসীনকে অথবা খোদ তাকে সমর্পণ করা হয়। এটি একটি সামাজিক (সমাজকল্যাণমূলক) কর্ম। যা সরকার তার

দেশবাসীর সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সময় অনুদান স্বরূপ দুর্গতদেরকে সাহায্য করে থাকে। সুতরাং এটি সরকারের তরফ থেকে একপ্রকার অনুদান। কোন বিনিময়চুক্তির ফলে বিনিময়ে অর্থ নয়। এ কারণে এই প্রকার অনুদান গ্রহণে কোন প্রকার দ্বিমত নেই।[৭৫]

২- **সমবায় বীমা** (MUTUAL INSURANCE) এর নিয়ম এই যে, যাদের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা একই ধরনের হয়ে থাকে এমন কতকগুলি লোক আপোসে মিলে-মিশে একটি ফান্ড্ তৈরী করে নেয়। অতঃপর তারা এই চুক্তিবদ্ধ হয় যে, আমাদের মধ্যে কেউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে এ ফান্ড্ থেকে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এ ফান্ডে কেবল তার সদস্যদের টাকা জমা থাকে এবং ক্ষতিপূরণ কেবল এ সকল সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৎসরান্তে হিসাব নেওয়া হয়।

ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত টাকার অংক যদি ফান্ডের টাকার চাইতে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সে হিসাবে সদস্যদের নিকট থেকে আরো বেশী টাকা আদায় করা হয়। আর ফান্ডের টাকা উদ্বৃত্ত হলে সদস্যদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয় অথবা তাদের তরফ থেকে আগামী বছরের জন্য ফান্ডের দেয় অংশ স্বরূপ রেখে নেওয়া হয়।

প্রারম্ভিকভাবে বীমার এই ধরনই প্রচলিত ছিল। যার বৈধ-অবৈধতার ব্যাপারে কোন দ্বৈধ নেই। যে সমস্ত উলামাগণ বীমা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই এর বৈধতার ব্যাপারে একমত।

৩- **বাণিজ্যিক বীমা** (COMMERCIAL INSURANCE)ঃ- এই বীমার নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোম্পানীর উদ্দেশ্য থাকে, বীমাকে বাণিজ্যরূপে পরিচালিত করা; যার মূল উদ্দেশ্য থাকে বীমার অসীলায় মুনাফা উপার্জন। এই কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের বীমার স্কীম জারী করে। যে ব্যক্তি বীমা করতে চায় তার সহিত বীমা কোম্পানীর এই চুক্তি থাকে যে, এত টাকা এত কিস্তিতে আপনি আদায় করবেন। নোকসানের ক্ষেত্রে কোম্পানী আপনার ক্ষতিপূরণ দেবে। কোম্পানী কিস্তীর পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য হিসাব করে নেয় যে, যে

[75] *(দিরাসাতুন শারইয়্যাহ ৪৭৭-৪৭৮ পৃঃ)*

সম্ভাব্য দুর্ঘটনার উপর বীমা করা হয়েছে তা কতবার হতে পারে? যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও কোম্পানীর মুনাফা অবশিষ্ট থাকে। আর এই পরিসংখ্যান করার জন্য বিশেষ কৌশল আছে; যার সুদক্ষ কৌশলীকে (ACTUARY) বা বীমাগাণনিক বলা হয়।

বর্তমানে এই ধরনের বীমার প্রচলন অধিক। আর এরই বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারটি সাম্প্রতিককালীন উলামাগণের অধিকতর বিতর্কের বিষয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানের মুসলিম-বিশ্বের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিসম্পন্ন উলামাগণের মতে তা অবৈধ। অধিকাংশ উলামাগণের ঐ জামাআত বলেন যে, এই বীমাতে জুয়ার গন্ধ আছে এবং সূদও। জুয়া এই জন্য বলা হচ্ছে যে, টাকা আদায়ের ব্যাপারটা এক পক্ষের (বীমাকারীর) তরফ থেকে নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। কিন্তু অপর পক্ষের (কোম্পানীর) তরফ থেকে তা সন্দিগ্ধ। বীমাকারী কিস্তীতে যে টাকা আদায় করে, তার সবটাই ডুবে যেতে পারে। আবার তার চাইতে বেশীও পেতে পারে। আর একেই জুয়া বলা হয়।

সূদ আছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে, এখানে টাকা দিয়ে বিনিময়ে টাকাই দেওয়া-নেওয়া হয়; যাতে কম বেশীও হয়ে থাকে। বীমাকারী কম টাকা জমা করলেও পাওয়ার সময় তার চেয়ে অনেক বেশীও পেয়ে থাকে।

সমবায় বীমা বৈধ

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ-এর শাখা সংস্থা ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী সউদী আরবের উচ্চপদস্থ উলামা বোর্ডের বীমা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে।

উক্ত বোর্ড ৪/৪/১৩৯৭ হিঃ তে প্রস্তাবনামা (৫১নং) পাস করে। যাতে বাণিজ্যিক বীমাকে অবৈধ বলা হয়েছে। আর সমবায় বীমাকে নিম্নোক্ত দলীলাদির ভিত্তিতে বৈধ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

১- সমবায় বীমা অনুদানমূলক চুক্তির পর্যায়ভুক্ত; যার লক্ষ্য হল বিপদের সময় কেবল পরস্পরকে সাহায্য করা এবং দুর্ঘটনার সময় দায়িত্বশীলতার বোঝা বহনে অপরের সাথে অংশ গ্রহণ করা। আর তা এইরূপে যে, কতিপয় লোক মিলে কিছু কিছু নগদ টাকা চাঁদাস্বরূপ দিয়ে

অংশ নেবে। যাতে সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সময়ে এ অর্থ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হবে। সুতরাং সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠানের সদস্যদলের উদ্দেশ্য বাণিজ্য অথবা অপরের অর্থের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন হয় না। এ দলের উদ্দেশ্য থাকে, কেবলমাত্র দুর্ঘটনা ও বিপদের ভারকে আপোসের মধ্যে ভাগাভাগি করে বহন করা এবং অপরের ক্ষতিপূরণে সাহায্য করা।

২- সমবায় বীমা (নিছক বেশী নেওয়ার সূদ ও সময় দেওয়ার বিনিময়ে ঋণের সূদ) উভয় প্রকার সূদ থেকেই পবিত্র। অতএব এতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বীমা-চুক্তি কোন সূদী চুক্তি নয়। আর তারা তাদের কিস্তীতে জমা করা টাকাকে সূদী কারবারেও খাটায় না।

৩- সমবায় বীমাতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপার্জিতব্য মুনাফা অনির্দিষ্ট ও অজানা থাকার কারণে এ চুক্তির কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, এরা সকলে সহায়তা ও অনুদানে অংশগ্রহণকারী। সুতরাং এর মাঝে না কোন ক্ষতির ঝুঁকি আছে, আর না কোন ধোঁকাবাজী ও জুয়াবাজী। পক্ষান্তরে বাণিজ্যিক বীমাতে এ সবকিছুই বিদ্যমান। কারণ এ বীমাতে যে চুক্তি হয় তা হল নিছক টাকার বিনিময়ে টাকা দেওয়া-নেওয়ার বাণিজ্যিক চুক্তি।

৪- সমবায় বীমার সদস্যদের কিস্তীতে জমা করা টাকা নিয়ে তাদের একটি গ্রুপ বা তাদের কোন প্রতিনিধি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসা করে পুঁজি বৃদ্ধি করা হয়। আর তাতেও সেই উদ্দেশ্যই থাকে, যে উদ্দেশ্যে সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উক্ত সিদ্ধান্তনামায় স্বাক্ষরকারী হলেন নিম্নলিখিত উচ্চ পদস্থ উলামায়ে কেরাম ঃ

১- মুহাম্মদ আলী হারাকান, জেনারেল সেক্রেটারী, ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ।

২- আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, উচ্চ বিচারবিভাগীয় পরিষদ্‌পাল, সঊদী আরব।

৩- আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, প্রধান, ইলমী গবেষণা, ফতোয়া, দাওয়াত এবং পথনির্দেশনা বিভাগ, সঊদী আরব।

৪- মুহাম্মদ মাহমূদ সাওয়াফ, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।

৫- সালেহ বিন উসাইমীন, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।
৬- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সুবাইয়িল, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।
৭- মুহাম্মদ রশীদ রাব্বানী মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।
৮- মুসতাফা যারকা, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।
৯- মুহাম্মদ রশীদী, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।
১০- আবুবকর জূমী, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।
১১- আব্দুল কুদ্দূস হাশেমী নদবী, মেম্বর, ফিক্‌হ একাডেমী।[৭৬]

বীমার প্রকরণ

বীমার আরো অন্যান্য শ্রেণীভাগও রয়েছে। পাঠকের উপকারার্থে আমরা সকল বীমার সংক্ষিপ্ত চিত্র পরিবেশন করছিঃ-
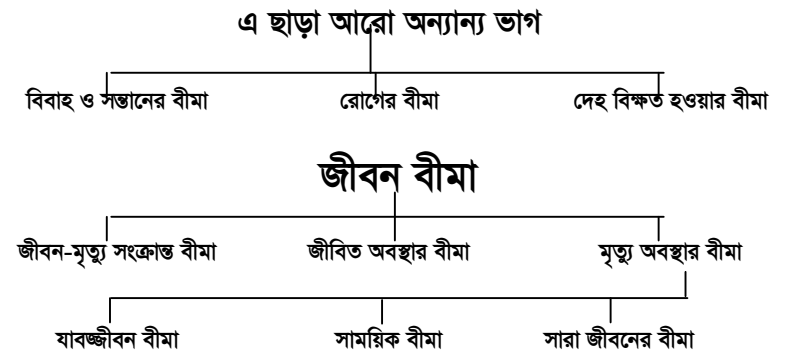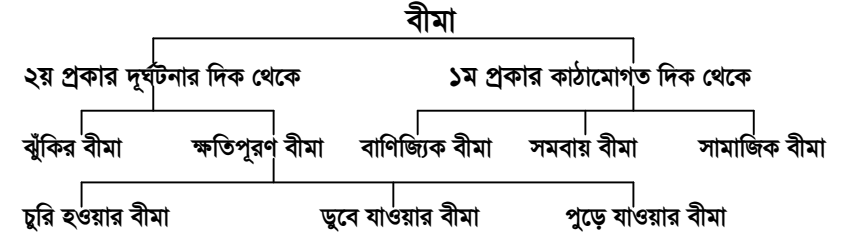
[76] (দিরাসাতুন শারইয়্যাহ ৪৭৭-৬০৬ পৃষ্ঠা, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২৬/৩৪১-৩৪৩)

পূর্বের আলোচনায় একথা প্রতিপাদিত হয়েছে যে, কোন প্রকারেরই বাণিজ্যিক বীমা বৈধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এর বিকল্প ব্যবস্থা কিছু আছে কি? এ ব্যাপারে বলা যায় যে, এর একটি প্রতিকল্প হল সমবায় বীমা; যাকে ইংরাজীতে MUTUAL INSURANCE বলে। যার কর্ম-পদ্ধতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

এ ছাড়া বর্তমানে মুসলিম-বিশ্বের কয়েকটি দেশেই JOINT LIABILITY COMPANY নামে কিছু কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এগুলোকে বাণিজ্যিক বীমার বিকল্পরূপে কায়েম করা হয়েছে। এর মৌলিক গঠন এরূপ যে, এ সকল কোম্পানীর শেয়ার্স হোল্ডার থাকে। কোম্পানী নিজে মূলধন কোন কল্যাণমূলক কর্মে বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ শেয়ার্স হোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করে। উক্ত কোম্পানীরই একটি রিজার্ভ ফান্ড্ থাকে। সেখান থেকে বীমাকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা যে, তিনি আমাদেরকে তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে হারাম জিনিস থেকে বেঁচে ও দূরে থাকার তওফীক ও প্রেরণা দান করুন। আমাদের হৃদয় মাঝে হারাম থেকে বাঁচার আগ্রহ সৃষ্টি করুন। আমীন।

اللهم اشهد فقد بلغنا

হে আল্লাহ! আমরা পৌঁছে দিলাম, তুমি সাক্ষী থাক।

*******সমাপ্ত*******

মুশতাক আহমদ কারীমী মদীনা নববিয়্যাহ ২২/৩/১৯৯৭	আব্দুল হামীদ মাদানী আল-মাজমাআহ ৩/১২/১৯৯৭

সঊদী আরব

প্রমাণ-পঞ্জী

১-ফাতহুল বারী, শারহু সহীহিল বুখারী, আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানী, দারুর্রাইয়ান লিত্তুরাস, কায়রো ছাপা

২- তুহফাতুল আহওয়াযী শারহু সুনানিত্ তিরমিযী, আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী, দারুল ফিক্র ছাপা ৩- আওনুল মা'বূদ শারহু সুনানি আবী দাঊদ, আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী, দারুল ফিক্র ছাপা, লেবানন, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৯

৪- নাইলুল আওতার মিন আহাদীসি সাইয়্যিদিল আখইয়ার, আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী আশ্‌শাওকানী, দারুত্তুরাস, কায়রো ছাপা

৫- সুবুলুস সালাম শারহু বুলূগিল মারাম, আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আসসান্‌আনী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বাইরুত ছাপা

৬- মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ ,আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী, দারু ইহয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, বাইরুত ছাপা

৭- ইহয়াউল উলূম, ইমাম গায্‌যালী

৮- ফাওয়াইদুল বুনূক হিয়ার রিয়াল হারাম, ডক্টর ইউসূফ কারযাবী, আল মাকতাবুল ইসলামীর ছাপা, ১৯৯৫

৯- আল মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ অররিবাবিয়্যাহ অইলা-জুহা ফিল ইসলাম, ডক্টর নূরুদ্দীন ইত্‌র, রিসালাহ বাইরুতের ছাপা, ১৯৭৮

১০- বুনূকুন তিজারিয়্যাহ বিদূনির রিবা, ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্রাহীম শাব্বানী, দারুল আলামিল কুতুব লিন্নাশ্‌র, রিয়াযের ছাপা, ১৯৮৭

১১- দিরাসাতুন শারইয়্যাহ লিআহাম্মিল উকূদিল মা-লিয়্যাতিল মুস্তাহদাসাহ, ডক্টর মুহাম্মদ আলআমীন মুস্তাফা শানক্বীত্বী, মাকতাবাতুল উলূম অলহিকাম, মদীনা নববিয়্যাহর ছাপা, ১৯৯২

১২- আল বুনূকুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান নাযারিয়্যাতি অত্তাত্ববীক্ব, ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ ত্বাইয়ার, দারুল অত্বান, রিয়াযের ছাপা, ১৯৯৪

১৩- আবহাসুল মু'তামারিস সানী লিলমাসরাফিল ইসলামী, কুয়েত, ডক্টর সুলাইমান আশক্বার, দারুন নাফায়িস, কুয়েতের ছাপা, ১৯৯০

১৪- মাসআলা-এ সূদ, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী, ইদারাতুল মাআরিফ, করাচীর ছাপা, ১৯৭৯

১৫- সূদ, সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদী, মারকাযী মাকতাবাহ ইসলামী, দিল্লীর ছাপা, ১৯৯৩

১৬- 'সূদ' এর অনুবাদ; সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকার ছাপা ১৯৮৭

১৭- ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত অ তিজারাত, জাষ্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী, ইদারাতুল মাআরিফ, করাচীর ছাপা, ১৯৯৫

১৮- আল মুআমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ অমাউক্বিফুশ্ শারীআতিল ইসলামিয়্যাতি মিনহা, ডক্টর সঊদ বিন সা'দ বিন দুরাইব, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮, ফটো কপি, লাইব্রেরী, মদীনা ইউনিভার্সিটি

১৯- মাউক্বিফুশ্ শারীআতি মিনাল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাতিল মুআসিরাহ, ডক্টর আব্দুল্লাহ আব্বাদী, ডক্টরেট থেসিস, দারুস সালাম ছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪

২০- আত্‌তাদাবীরুল ওয়াক্বিইয়্যাহ মিনার্রিবা ফিল ইসলাম, ডক্টর ফয্‌ল ইলাহী, ওস্তায ইমাম মুহাম্মদ বিন সঊদ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, রিয়ায, ইদারাতু তারজুমানিল ইসলাম, গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬

২১- আলমুআমালাতুল মালিয়্যাতুল মুআসিরাহ ফিল ফিক্বহিল ইসলামি ডক্টর উসমান শাব্বীর, দারুন্নাফাইস, জর্ডান ছাপা, ১৯৯৬

২২- তাতবীরুল আ'মালিল মাসরাফিয়্যাহ, ডক্টর সামী হাসান, দারুল ইত্তিহাদুল আরাবী, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬

২৩- আল জামিউ ফী অসূলির্রিবা, ডক্টর ইউনুস মিসরী, দারুল কলম ছাপা দেমাস্ক প্রথম সংস্করণ ১৯৯১

২৪- আলবুনূকুল ইসলামিয়্যাহ, অসূলুহাল ইদারিয়্যাতু অলমুহাসিবিয়্যাহ, ডক্টর নিযাল সাব্‌রী, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬

২৫- আলকাউলুল ফাস্‌ল ফির্রদ্দি আলা মুবীহী রিবান নাসিআতি অলফায্‌ল্, শাইখ আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরী